
মৃত্যুবাণ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
দুটি বই
একত্রে

বই লাভার'স পোলাপান :-)

মাসুদ রানা-৩৫৯

মৃত্যুবাণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

এ এক নতুন জাতসাপ, ধনঞ্জয় ভূপতি। তাকে ধরার জন্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে হাজির হয়েছে প্রখ্যাত ওঝা বাবুরাম সাপুড়ে। কিন্তু গাইগার কাউন্টারটা প্রমোদতরী জলপরীতে নিয়ে যাবে কে? আছে একজন--পাগল করা রূপ-যৌবন মেয়েটির, নাম তৃষ্ণা।

কেউ কি ভাবছেন,এর মধ্যে মাসুদ রানা কোথায়?

আছে তো!

এ,এইচ,এম,মুহিত

মৃত্যুবাণ

প্রথম প্রকাশ:২০০৬

এক

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা। চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের চেম্বার।

জরুরি ডাক পেয়ে বসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে মাসুদ রানা। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, এমনি একটা নিরীহ ভাব নিয়ে চেম্বারে ঢুকল ও।

'এসো, রানা,' বললেন বস্। 'বসো।'

একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসল রানা। মুখ তুলে কত দিনের পরিচিত শান্ত, কালো, অতি মাত্রায় স্বচ্ছ চোখ দু'টোর দিকে তাকাল। কী লেখা আছে ওগুলোয়, কিছু কি পড়তে পারছে ও?

'অনেক কাজ আজ,' বললেন বস্। 'তাই ভাবলাম ব্যস্ততা শুরু হবার আগেই তোমার ব্যাপারটা সেরে ফেলি।'

রানার উত্তেজনা প্রতি মুহূর্তে কমছে। বস্ যখন এমআরনাইন না বলে ওর নাম ধরেন, অতীত অভিজ্ঞতা বলে দেয় লক্ষণ মোটেও আশাপ্রদ কিছু নয়। ওর ব্যাপারটা সেরে ফেলতে চাইছেন। ওর কোন্ ব্যাপারটা? আল্লাহ মালুম! না, এটা কোনও কাজ অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্ট বলে মনে হচ্ছে না। বোধহয় ব্যক্তিগত কিছু। বসের গলার স্বরে তেমন কিছু পায়নি ও। তার মানে খুব বড়, উত্তেজক কোন খবর নয়। তবে আগ্রহী মনে হচ্ছে বসকে, খোশ মেজাজে আছেন, চোখেমুখে সস্নেহ, আন্তরিক একটা ভাব।

'জী, সার,' বিড়বিড় করল রানা।

'বেশ কিছুদিন তোমাকে আমি দেখিনি, রানা। কেমন ছিলে বলো তো? তোমার স্বাস্থ্যের কথা বলছি আর কি।' ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে ভাঁজ খুললেন রাহাত খান। একটা ফর্ম বা ওই ধরনের কিছু হবে। এমনভাবে ধরে আছেন, যেন পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সন্দেহে ভুগছে রানা। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কী আছে কাগজটায়, ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে। তাড়াতাড়ি বলল ও, 'আমি ভাল আছি, সার।'

'কিন্তু এখানে আমাদের মেডিকেল অফিসার তোমার সঙ্গে একমত নন,' নরম সুরে বললেন রাহাত খান। 'তিনি কী বলেন শোনা দরকার তোমার।'

ভুরু কুঁচকে কাগজটার পিছন দিকে তাকাল রানা। তাঁর কথা শোনা উচিত? ওহ্, গড! কে জানে কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে পানি। 'জী, সার,' বলতে হলো ওকে।

রানার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন বিসিআই চিফ, যেন ওর মাপ নিচ্ছেন, ভাল-মন্দ বোঝার চেষ্টা করছেন। কাগজটা চোখের আরও কাছাকাছি তুললেন তিনি। 'এখানে টেকনিকাল ভাষায় বলা হয়েছে, ফিজিকালি সব ঠিক আছে তোমার। কিন্তু নিকোটিন আর অ্যালকোহল খুব বেশি কনজিউম করছো। প্রায়ই যে মাথাব্যথা হচ্ছে, এটা ভাল লক্ষণ নয়। জিভে সাদা সর জমছে, ব্লাডপ্রেশার ১৬০/৯০, লিভার ঠিকমত কাজ করছে না। এ-সব কারণে প্রফেশনাল এজেন্ট হিসেবে তোমাকে ফিল্ডে রাখাটা একদম উচিত নয় বলে রায় দিচ্ছেন ভদ্রলোক। অবশ্য সমস্যার সমাধানও বাতলে দিয়েছেন তিনি।

'দুই কি তিন হপ্তা ছুটি দরকার তোমার। ছুটির সময়টায় জীবনযাপনে থাকতে হবে সংযম। নিকোটিন আর অ্যালকোহল ছোঁয়া তো দূরের কথা, ওসবের দিকে তাকানো পর্যন্ত নিষেধ। ব্যস, তা হলেই আবার তুমি আগের সেই এক্সেপশনালি ভাল ফিজিকাল ফিটনেস ফিরে পাবে।'

হাত লম্বা করে রিপোর্টটা 'আউট' লেখা ট্রেতে রেখে দিলেন রাহাত খান। শিরদাঁড়া খাড়া করলেন, রানার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন, বললেন, 'এই রিপোর্ট আমাকে হতাশ করেছে, রানা। তুমি নিশ্চয়ই যার-পর-নাই লজ্জিত?'

ধৈর্য হারানোর সুরটা চেপে রাখতে চেষ্টা করল রানা। 'আমি আসলে সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, সার। মাঝে-মধ্যে মাথায় ব্যথা তো হতেই পারে। আর যে যুগ পড়েছে, ব্লাডপ্রেশার তো সবারই বাড়তির দিকে। লিভারের জন্যে হয়তো একটা ওষুধ খেতে হতে পারে—খাব। আসলে ও কিছু নয়, সার।'

'এখানেই খুব বড় একটা ভুল করছ তুমি, রানা,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান। 'ওষুধ খাওয়া মানেই তো লক্ষণগুলোকে চেপে রাখার ব্যবস্থা করা। রোগটা তো তাতে সারল না। চেপে রাখার ফলে একসময় ক্রনিক ডিজিজ হয়ে দেখা দেবে। সব ওষুধই আমাদের সিস্টেমের জন্যে ক্ষতিকর। কথাটা আমাদের বেশিরভাগ খাবার সম্পর্কেও সত্যি। যেমন—টিনের দুধ, বেশি করে ভাজা বা সেদ্ধ করা তরিতরকারি। ধবধবে সাদা ময়দার কথাই ধরো।' পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে চোখ বুলাচ্ছেন। 'প্রচুর পরিমাণে চক আছে ওতে। আর আছে বেনজল প্যারক্সাইড, ক্লোরিন গ্যাস, ফিটকিরি ইত্যাদি।' বন্ধ করে পকেটে রেখে দিলেন নোটবুকটা। 'কী মনে হলো, বলো।'

কী ঘটতে চলেছে বুঝতে না পেরে রানা হতভম্ব। আত্মরক্ষার সুরে বলল, 'অত বেশি রুটি আমি খাই না, সার।'

'তা হয়তো খাও না,' ধৈর্য হারানোর সুরে বললেন বস্। 'তবে জাঁতায় পেষাই করা কতটুকু গম খাও তুমি? কতটুকু দই? রান্না না করা তরকারি, বাদাম আর তাজা ফল?'

রানা একটু হাসল। 'না খাওয়ারই মত, সার।'

'এটা হাসির কোনও ব্যাপার নয়, রানা।' প্রসঙ্গটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য টেবিলে তর্জনীর গাঁঠ ঠুকলেন বিসিআই চিফ। 'কী বলি, মন দিয়ে শোনো। প্রাকৃতিক পদ্ধতি ছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার অন্য আর কোনও উপায় নেই। তোমার সমস্ত সমস্যার...' প্রতিবাদ করবে বলে মুখ খুলল রানা, কিন্তু বস্ হাত তুলে থামিয়ে দিলেন ওকে... 'মূলে হলো প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অসংযমী জীবনযাপন।' তারপর, একটু বিরতি নিয়ে বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসলেন, 'সেবাস্তিয়ান নেইপ-এর নাম শুনেছ?'

হাঁ হয়ে গেছে রানা।

'না, সার।'

'একটু হয়তো প্রাচীন, তবে গ্রেট নেচারোপ্যাথ। তাঁর অনুসারী থেরাপিস্টরা একের পর এক নিউরোপ্যাথিক স্কুল খুলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রায় একটা বিপ্লবই ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। আধুনিক অনেক নেচারোপ্যাথ আছেন, যাঁদের অমূল্য শিক্ষা বোকার মত অগ্রাহ্য করি আমরা। ভাগ্যক্রমে,' আগ্রহের আতিশয্যে রাহাত খানের চোখ জোড়া চকচক করে উঠল, 'গ্রেট নেচারোপ্যাথ অনেকেই প্র্যাকটিস করছেন আশপাশের কয়েকটা দেশে। প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ হবার সুযোগ আমাদের নাগালের বাইরে নয়।'

কৌতূহলী চোখে বসকে দেখছে রানা। হঠাৎ করে বুড়োর হলোটা কী? এ-সব ভীমরতি ধরার প্রাথমিক লক্ষণ নয় তো? উঁহুঁ, বরং আগের চেয়েও সুস্থ-সবল আর সতেজ লাগছে বস্‌কে। ঠাণ্ডা, কালো চোখ দুটো স্ফটিকের মত ঝকঝকে। রেখা আর ভাঁজ সহ কঠিন অবয়ব সুস্বাস্থ্যের কল্যাণে জ্বলজ্বল করছে। এমন কী ভুরু ও মাথার কাঁচা-পাকা চুলও যেন নতুন জেল্লা পেয়েছে। তা হলে এই পাগলামির কী কারণ?

'ইন' লেখা ট্রের দিকে হাত বাড়ালেন রাহাত খান, সেটাকে টেনে নিজের সামনে নিয়ে এসে আভাস দিলেন রানা এখন বিদায় নিলে পারে। 'তো, এইটুকুই, রানা। ইলোরা প্লেনের টিকিট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমাকে ঠিকঠাক করার জন্যে দুই হপ্তা যথেষ্ট সময়। ওখান থেকে বেরুবার পর নিজেকে তুমি চিনতে পারবে না। ঠিক যেন নতুন একজন মানুষ।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা। ধরা গলায় জানতে চাইল, 'আমি কোথায় যাচ্ছি, সার?'

'কৃপানিধি হারবারিয়াম, একটা ক্লিনিক। থাইল্যান্ড, ব্যাঙ্ককে। নিজের পেশায় বেশ নামকরা এক ভদ্রলোক ওটা চালান—ডক্টর কৃপানিধি, থানকুচি কৃপানিধি। দারুণ ব্যক্তিত্ব। পঁয়ষট্টির কম নন। তবে দেখে চল্লিশের চেয়ে এক দিনও বেশি

মনে হবে না।

'আমার সুপারিশ নিয়ে যাচ্ছ তো, ভাল কেয়ার নেবেন তোমার। স্টেট-অভ-দি-আর্ট ইকুইপমেন্ট। পেছনের উঠানে নিজের হার্ব বাগান পর্যন্ত করেছেন।'

'সার,' কাতর কণ্ঠে কিছু বলতে চাইছে রানা।

'বুঝেছি, এখানকার কাজের কথা ভাবছ তুমি। না, এ নিয়ে মোটেও চিন্তা করবে না। দুই হপ্তার জন্যে সব ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে। তোমার সেকশনের দায়িত্ব এরই মধ্যে এসএসথ্রিকে নিতে বলে দিয়েছি আমি।'

রানার সন্দেহ, বাস্তবে এ-সব ঘটছে না। স্বপ্ন দেখছে ও, ঘুমটা ভাঙলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলল, 'কিন্তু, সার, মানে...আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি আসলে... মানে, এর কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন আছে?'

'না।' রাহাত খানের মুখে শান্ত হাসি। 'প্রয়োজন নয়। এটা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ যদি তুমি বিসিআই এজেন্ট হিসেবে ফিল্ডে থাকতে চাও। ফিল্ডে আমি তো এমন কাউকে পাঠাতে পারি না যে শতকরা একশো ভাগ ফিট নয়।' চোখ নামিয়ে নিজের সামনের বাস্কেটের ভিতর তাকালেন। 'এবার তুমি এসো, এমআরনাইন।' চোখ তুলে তাকালেন না। কথার সুরেই জানিয়ে দিয়েছেন এ-প্রসঙ্গে আর কিছু শুনতে বা বলতে রাজি নন তিনি।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। কিছু বলল না। ঘুরল, হেঁটে বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে, দরজাটা বন্ধ করল যতটা সম্ভব নরম হাতে।

ঝট্ করে মুখ তুলল ইলোরা। দেখছে ওকে।

সোজা হেঁটে এসে তার ডেস্কে একটা ঘুসি মারল রানা, এত জোরে যে কমপিউটার মনিটরটা ছোট্ট একটা লাফ দিল। হিসহিস করে বলল ও, 'এর মানেটা কী, ইলোরা? তা হলে কি ধরে নেব বুড়ো সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে? বিশ্বাস করো, স্রেফ প্রলাপ বকছে। দেখি কে আমাকে কোথায় পাঠায়! একটা পাগলের কথা আমাকে শুনতে হবে নাকি!'

রাহাত খানের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা হঠাৎ যেন কী এক আনন্দ পেয়ে হেসে উঠল। 'ম্যানেজার ভদ্রলোক কী যে ভাল, সে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। টেলিফোনে আমাকে বললেন নতুন দালানের কোণের কামরাটা দেবেন তোমাকে। চিরহরিৎ মার্টল গাছের পাশেই ওটা, ফলে তোমার কামরাটা সারাক্ষণ সুগন্ধে ভরে থাকবে। তুমি জানো, ওদের নিজস্ব হার্ব বাগান আছে?'

'জানি না আবার! শোনো, ইলোরা, প্লিজ!' আবেদনের সুরে কথা বলছে রানা। 'অন্তত একটিবার লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে আমাকে জানাও আসলে ব্যাপারটা কী। বস্ এমন করছেন কেন?'

'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'বলো?'

'কেমন দেখলে বস্‌কে? মানে, ফিজিক্যালি?'

'কীভাবে যেন বয়স কমে গেছে মনে হলো—অন্তত দশ বছর তো হবেই।'

'তোমাকে যেখানে পাঠাচ্ছেন, দুই হপ্তা ওখানে কাটিয়ে পরশু দিন ফিরেছেন বস্‌,' বলল ইলোরা। 'আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছ?'

'কিন্তু...'

'তুমি তো জানো, নতুন কিছু পেলে বস্‌ চেষ্টা করে দেখেন সেটা কাজে লাগানো যায় কিনা। গত মাসে ক্লাবের এক বন্ধু কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলেন, আমরা সবাই আসলে মোটর গাড়ি, মাঝে-মধ্যে গ্যারেজে গিয়ে ডিকার্বোনাইজড হওয়া দরকার। এরকম একটা ভাল গ্যারেজের নামও তিনি জানান বস্‌কে—কৃপানিধি হারবারিয়াম। কথাটা নাড়া দেয় বসকে। সত্যি ফল পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে নিজেই চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছেন নতুন একজন মানুষ হয়ে। আমার তো রীতিমত শক্ত-সমর্থ তরুণ লাগছে...'

'থামো!' ধমকে উঠল রানা। 'নিজে গিয়েছিলেন ভাল কথা। কিন্তু ঘাড় ধরে আমাকে ওখানে যেতে বাধ্য করার মানেটা কী?'

ইলোরার ঠোঁটে এক টুকরো রহস্যময় হাসি ফুটল। 'তুমি জানো তোমাকে নিয়ে কতখানি চিন্তা করেন বস্‌—কিংবা হয়তো জানো না। যাই হোক, মেডিকেল রিপোর্টটা দেখামাত্র আমাকে ডেকে বললেন তোমাকে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাঙ্ককে, ডক্টর থানকুচি কৃপানিধির কাছে পাঠিয়ে দিই।' নাক কোঁচকাল ইলোরা। 'কিন্তু, রানা, তুমি কি সত্যিই অত সিগারেট আর অ্যালকোহল খাও? শরীরের জন্যে ও-সব যে ভাল নয় তা তো তুমিও জানো।' রানার দিকে স্নেহময়ীর দৃষ্টিতে তাকাল সে।

অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে রানা। 'সংক্ষেপে বলি। আমার তৃষ্ণা আছে, সেটাকে মেটাতে হবে। আর সিগারেটের কথা যদি বলো, সত্যি জানি না হাত দুটোকে নিয়ে কী করব আমি।'

ইলোরার চেহারায় বিরূপ ভাব ফুটল। 'তোমার হাত সম্পর্কে...আমি তো অন্য কথা শুনেছি।'

'দেখো, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।' রাগের সঙ্গে দরজার দিকে এগোচ্ছিল রানা, ঘুরে দাঁড়াল। 'আমার হাত সম্পর্কে যা-ই শুনে থাকো তুমি, এটা নিশ্চয়ই শোননি—পেত্নিদের গলা টিপে ধরি আমি, না মরা পর্যন্ত ছাড়ি না।'

মিষ্টি করে হাসল ইলোরা। 'আমি যদি এত অপূর্ব সুন্দরী না হয়ে পেত্নি হতাম, তবু শুধু বাদাম আর লেবুর রস খেয়ে দু'হপ্তা কাটাবার পর গলা টিপে ধরার মত জোর তুমি পেতে না, রানা।'

'উহু! সুন্দরী! আবার অপূর্ব!' চাপা কণ্ঠে খেঁকিয়ে ওঠার মত একটা আওয়াজ করে ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

দুই

ব্যাঙ্কক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

পরনে জিনস আর বাদামী টি-শার্ট, হাতে হালকা সুটকেস, টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এল রানা। বিশাল চত্বরের দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'সারি গাড়ি–ডান পাশে ট্যাক্সি, বাম পাশে প্রাইভেট কার। ফুরফুরে মেজাজ, ঠোঁটে একটা ইংরেজি গানের শিস, ধাপ কটা টপকে বাঁ দিকে এগোল ও।

লাইনের চার নম্বর প্রাইভেট কার একটা টয়োটা স্প্রিন্টার, গায়ে ইংরেজি হরফে বড়-বড় করে লেখা রয়েছে–কৃপানিধি হারবারিয়াম। সবুজ ইউনিফর্ম পরা সপ্রতিভ তরুণ ড্রাইভারকে বেশ চটপটে মনে হলো, চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। এক পা এগিয়ে এসে সবিনয়ে জানতে চাইল, 'ঢাকা থেকে, মিস্টার মাসুদ রানা?' রানা মাথা ঝাঁকাতে সুটকেসটা চেয়ে নিয়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে দিল সে। 'প্লিজ, সার,' বলে একপাশে সরে দাঁড়াল।

'কী নাম তোমার?'

'উনু, সার। উনু থানাই।'

'কৃপানিধি হারবারিয়াম এখান থেকে কত দূর?' থানাই গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বারো মাইল, সার,' বলল থানাই। 'ঘুরিয়ে নিয়ে যাব, যাতে জ্যামে পড়তে না হয়। আবার কখন ফিরবেন, সার?'

'ফিরব?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'সরি?'

'না, মানে... আমার আসলে জানতে চাওয়া উচিত ছিল আপনি শুধু ভিজিট করছেন, নাকি...'

'আমি ভর্তি হব, চিকিৎসা নিতে এসেছি।'

'ও!' গলার আওয়াজই বলে দিল থানাই খুব অবাক হয়েছে।

'কী ব্যাপার, থানাই?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, মানে, আমাদের ওখানে বেশির ভাগই মেদসর্বস্ব মহিলা আর বুড়ো-হাবড়ারা ভর্তি হয়। তাদের মধ্যে আশ্চর্য একটা মিল কী জানেন, সার? সবাই আমাকে আস্তে গাড়ি চালাতে বলে।'

'হুম।' রানার হাসিখুশি চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'জায়গাটা সম্পর্কে একটা ধারণা দাও দেখি।'

'সংক্ষেপে বলি? আমাদের এখানে চিকিৎসা করতে হলে অনেক টাকা খরচ, কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে শুধু পানি খেয়ে।' মাথা নাড়ল থানাই। 'আমি তো বিনা পয়সাতেও রাজি হব না।'

খলং প্রেম প্রজাকর্ন বরাবর ছুটছে টয়োটা। প্লেনে বসে ব্যাঙ্কক সিটি ম্যাপের উপর চোখ বুলিয়েছে রানা। শতরু পাইকে ডানে রেখে রাত চাসিমায় পৌঁছুতে হবে ওদেরকে, কৃপানিধি হারবারিয়ামটা ওদিকেই।

খানিক পরেই নীরবতা ভেঙে ড্রাইভার বলল, 'প্রায় পৌঁছে গেছি, সার। আর অল্প দূর।'

রাস্তার পাশে তীরের মত দেখতে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল রানার, তাতে লেখা–

কৃপানিধি হারবারিয়াম
স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার ঠিকানা।
ডানদিকের প্রথম গলি।
নীরবতা কাম্য।

রাস্তার দু'পাশে থোক থোক চিরহরিৎ লতা-গুল্ম আর ঔষধির ঝোপ চোখে পড়ল। তারপর একপাশে উঁচু একটা পাঁচিল শুরু হলো। দরজাটাকে ফটক বা তোরণ বললেই যেন বেশি মানায়। ভিতরে বড় একটা মাঠ। চারদিকে প্রচুর গাছপালা। কিছু ঝোপের পিছন থেকে সামান্য ধোঁয়া উঠছে। কাঁকর ছড়ানো গাড়িপথ ধরে ধীরগতিতে টয়োটা চালাচ্ছে তরুণ থানাই। দু'বার বাঁক নিতে হলো। ঝোপের আড়াল থাকায় দেখার সুযোগ ছিল না, দ্বিতীয়বার সামনে পড়ল বৃদ্ধ এক দম্পতি। কাঁপা-কাঁপা পা ফেলে গাড়ি পথ ছেড়ে ঘাসের উপর নেমে গেল তারা, পরস্পরকে সাহায্য করার চেষ্টায় দু'জনেই আছাড় খেয়ে পড়ার উপক্রম করছে।

সামনে একটা খোলা লন পড়ল। এখানে সবাই শ্লথ। নড়তে-চড়তে প্রচুর সময় নিচ্ছে। কেউ একা, কেউ সঙ্গী বা সঙ্গিনী সহ। সাইনবোর্ডে লেখা: সিগারেট খাওয়া নিষেধ। কথা কম বলুন।

লতানো গাছে ঢাকা খিলানের ভিতর দিয়ে গাড়ি-বারান্দায় ঢুকে থামল টয়োটা। পিছনের বনেট খুলে সুটকেসটা এনে দিল ড্রাইভার। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে, বৌদ্ধদের কায়দায় বার তিনেক কুর্নিশ করে বিদায় নিল লোকটা।

ধাপ কটা টপকে ভারী দরজা ঠেলে দালানের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা।

নীরব একটি হলঘর। দেয়াল জুড়ে চকচক করছে কাঠের প্যানেল। ধবধবে

সাদা কাভারঅল পরা যে মেয়েটি রিসেপশন ডেস্কে বসে রয়েছে, সে আন্তর্জাতিক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার যোগ্যতা রাখে। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাগত জানাল ওকে। রেজিস্টার বুকে সই করার পর তার পিছু নিল রানা।

সাজানো-গোছানো কয়েকটা কামরার ভিতর দিয়ে একটা সাদা করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। রানা ধারণা করল বাড়ির পিছন দিক এটা। দালানের বাড়তি অংশে যাওয়ার জন্য একটা দরজা পেরুতে হলো। চওড়া প্যাসেজের দু'ধারে বেশ কয়েকটা কামরা, দরজার গায়ে ফুল অথবা ঔষধির নাম লেখা। রানাকে ইঙ্গিতে 'মার্টল' লেখা দরজাটা দেখিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর জানাল, 'সার এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে সাক্ষাৎ দেবেন।' ঘুরে নিঃশব্দ পায়ে ফিরে গেল সে।

ভিতরে ঢুকল রানা। মাঝারি আকারের কামরা। সাধারণ ফার্নিচার। বিছানায় সুতি চাদর। বিছানার মাথার কাছে দুটো ফ্লাওয়ার ভাসে তাজা ফুল। বেডসাইড টেবিলে একটা বই রয়েছে, নাম—নেচার কিয়োর।

কামরার বন্ধ একটা জানালা খুলে দিল রানা। একটা সূর্য ঘড়িকে মাঝখানে রেখে সারির পর সারি নাম-না-জানা ছোট ছোট স্বাস্থ্যবান, উৎফুল্ল চারাগাছ ওকে দেখে যেন খিল-খিল করে হেসে উঠল। এটাই তা হলে এখানকার হার্ব গার্ডেন।

সুটকেস থেকে দরকারী জিনিস-পত্র বের করে যেখানে যেটা রাখার রেখে আরামকেদারায় বসল রানা, শরীরের উৎপাদিত বর্জ্য কীভাবে বিনষ্ট করা যায় পড়ছে।

বইটাতে এমন সব খাবারের কথা লেখা রয়েছে, জীবনে যেগুলোর নামও শোনেনি রানা। যেমন—পটাশিয়াম ব্রথ আর নাট মিনস।

আরেক পরিচ্ছেদে ম্যাসাজ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার শুরুতেই আদেশের ভঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ম্যাসাজ একটা শিল্প, একে এফ্লোরাজ, পেট্রিসাজ, স্ট্রোকিং, ট্র্যাকশন, টাপোটমেন্ট, ভাইব্রেইশন আর নিডিং, এই সাতভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

বেশি দূর পড়া হলো না রানার; টেলিফোনটা বেজে উঠল। একটি নারীকণ্ঠ জানাল, 'দয়া করে আপনি যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে কনসাল্টিং রুমে পৌছাতে পারেন, ডক্টর থানকুচি কৃপানিধি অত্যন্ত খুশি হবেন।'

ডক্টর থানকুচি কৃপানিধি দৃঢ়ভঙ্গিতে করমর্দন করলেন। তালুটা শুকনো। ভারী কণ্ঠস্বরে অনুরণন আছে। মাথায় এক রাশ সাদা চুল। পরিষ্কার কালো নরম চোখ। ঠোঁটের হাসিটা আন্তরিক। সাদা, ঢোলা জোব্বা পরেছেন, প্রায় আলখেল্লার মতই দেখতে। হলদেটে রঙের লোমশ হাত শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলে আছে শরীরের

দু'পাশে। চপ্পল পরেছেন, কনসাল্টিং রুমে হাঁটার সময় মনে হলো পায়ে যেন স্প্রিং লাগানো আছে।

রানাকে জাঙ্গিয়া ছাড়া সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেলতে বললেন তিনি। শরীরের দাগগুলোয় চোখ বুলাবার পর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এ কী কাণ্ড, মিস্টার রানা? দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধে ছিলেন আপনি।'

নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিল রানা, 'গেছিলাম আর একটু হলে। হ্যাঁ, যুদ্ধেই।'

'তাই? মানুষে মানুষে যুদ্ধ খুবই বাজে একটা ব্যাপার। এবার, প্লিজ, গভীর করে শ্বাস নিন।'

রানার পিঠ আর বুকের আওয়াজ শুনলেন ডক্টর কৃপানিধি, ব্লাডপ্রেশার মাপলেন, ওজন নিলেন, লিখলেন কতটা লম্বা। তারপর সার্জিকাল কাউচের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বললেন, নরম আঙুল দিয়ে হাড়ের প্রতিটি জয়েন্ট আর মেরুদণ্ড পরীক্ষা করলেন তিনি।

কাপড় পরছে রানা, ডেস্কে বসে খসখস করে কিছু লিখছেন ডক্টর থানকুচি কৃপানিধি। একটু পরেই হেলান দিলেন চেয়ারে। 'না, মিস্টার রানা, উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু নয়। ব্লাডপ্রেশার একটু বেশি; আপার ভার্টিব্রায় সামান্য জখম আছে–সেটাই সম্ভবত আপনার মাথাব্যথার কারণ সৃষ্টি করছে; ইলিয়াম, একটা আপার হিপবোন, পেছন দিকে একটু হেলে আছে। সন্দেহ নেই খুব জোরে পড়ে গিয়েছিলেন।' চোখ তুলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকিয়ে থাকলেন ডক্টর কৃপানিধি।

রানা বলল, 'হয়তো।'

'বেশ, তা হলে–' ছাপা একটা ফর্ম টেনে নিলেন ডক্টর কৃপানিধি, তালিকায় টিক চিহ্ন দিচ্ছেন। 'রক্তস্রোত থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করার জন্যে এক হপ্তা কঠিন ডায়েট মেনে চলতে হবে। ঝরঝরে, তাজা ভাব আনার জন্যে ম্যাসাজ চলবে। চলবে ঠাণ্ডা-গরম সিট্‌স্ বাথ। হাড়ের জখম আর সম্ভাব্য স্থানচ্যুতি সারাবার জন্যে অস্টিয়প্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি ট্র্যাকশন-এর ওপর একটা শর্ট কোর্স দরকার হবে। আর, অবশ্যই, পরিপূর্ণ বিশ্রাম।'

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

'ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নিন, মিস্টার রানা। যতটুকু জানি, আপনি একজন সিভিল সার্ভেন্ট। রাজ্যের ফাইল-ওঅর্ক থেকে দিন কয়েকের জন্যে সরে থাকাটা আপনার জন্যে অত্যন্ত উপকারী হবে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে রানার হাতে ছাপা ফর্মটা ধরিয়ে দিলেন ডক্টর কৃপানিধি। 'আধঘণ্টার মধ্যে ট্রিটমেন্ট রুমে চলে যান, মিস্টার রানা। এখনই শুরু করলে কোন ক্ষতি নেই।'

'ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম। ভাল কথা, ট্র্যাকশন মানে তো জানেনই—মেরুদণ্ডকে টেনেটুনে ঠিকঠাক করার একটা মেডিকেল ডিভাইস। খুবই উপকারী।' তৃপ্তির সঙ্গে হাসলেন ডক্টর থানকুচি কৃপানিধি। 'অন্যান্য রোগীরা কে কী বলল না বলল তাতে কান দেবেন না। তারা কেউ কেউ ব্যাপারটাকে টরচার বলে। বোঝেনই তো ননির পুতুলরা কেমন হয়।'

'হ্যাঁ।'

সাদা রঙ করা করিডর ধরে ফিরছে রানা। সাজানো কামরাগুলোয় বসে লোকজন হয় পড়ছে, নয়তো নিচু গলায় গল্প করছে। সবাই তারা প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, উচ্চ-মধ্যবিত্ত। বেশ কজন বিদেশীও আছে। দু'একজন শ্বেতাঙ্গকেও দেখল রানা। তবে বেশির ভাগই বয়স্ক মহিলা।

পালাতে পারলে বাঁচে এরকম একটা অস্থির ভাব নিয়ে হলঘর হয়ে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা, তাজা বাতাসে শ্বাস নিল বুক ভরে।

কেয়ারি করা বাগানের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে পরিচ্ছন্ন গাড়িপথ, চেহারায় চিন্তামগ্ন একটা ভাব নিয়ে সেটা ধরে হাঁটছে রানা, নাকে ফুলের সুবাস ভাল লাগছে। এ-সব কি সহ্য করতে পারবে ও? বিসিআই থেকে বিদায় না নিয়ে এই নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় আছে কি? গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে, ফলে সাদা কাপড়ে মোড়া একটা নারী মূর্তির সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল।

বাঁক ঘুরে হন হন করে এগিয়ে আসছিল সে। দু'জনেই একেবারে শেষ মুহূর্তে সাবধান হতে পারায় সংঘর্ষ ঘটল না, পরস্পরকে নিরাপদেই পাশ কাটাল ওরা। ছিটকে গাড়িপথের মাঝখানে চলে গেছে, পাশ কাটাবার মুহূর্তে সকৌতুক একটু হাসি ফুটল মেয়েটির ঠোঁটে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁক ঘুরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো প্রকাণ্ড একটা কালো মার্সিডিজ।

ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটতে দেখছে রানা, অথচ জানে চেষ্টা করলেও সময়ের অভাবে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারবে না। সত্যি কি পারবে না? বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে।

এই মুহূর্তে চাকার তলায় প্রায় চলে গেছে মেয়েটি, পরমুহূর্তে তার কোমরে হাত জড়িয়ে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, গাড়ির বনেটের উপর দিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে এল তাকে।

মেয়েটিকে ঘাসের উপর নামিয়েছে রানা, ব্রেক কষে কাঁকরের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল কালো মার্সিডিজ। রানার ডান হাতে লেগে রয়েছে ভরাট আর নিরেট একটা স্তনের স্মৃতি। মেয়েটি 'ওহ্!' বলে মুখ তুলে ওর চোখে তাকাল, দৃষ্টিতে আকস্মিক বিহ্বলতা। তারপর সে উপলব্ধি করল কী ঘটে গেছে, রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ওহ্, ধন্যবাদ।' গাড়িটার দিকে ঘুরল এবার।

মার্সিডিজের ড্রাইভিং সিট থেকে ধীরেসুস্থে নীচে নামছে একজন শ্বেতাঙ্গ লোক। শান্ত ভঙ্গিতে বলল সে, 'সত্যি, খুবই দুঃখিত। আপনার কোথাও লাগেনি তো?' তারপর চিনতে পেরে হাসি ফুটল মুখে। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'কী আশ্চর্য, আমার বান্ধবী সনম না? ওহ্, ইয়েস, অভ কোর্স–শিল্পা সনম! কেমন আছ, শিল্পা? আমার জন্যে প্রস্তুত?'

এরকম সুদর্শন আর সুপুরুষ খুব কম দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ, তবে রোদে পুড়ে গায়ের রঙ দাঁড়িয়েছে গাঢ় তামা। মুখের চারপাশ ভরাট আর শক্ত, স্বপ্নের মধ্যে যে-ধরনের ঠোঁটে চুমো খেতে পছন্দ করে মেয়েরা। গোঁফ জোড়া মাপ মত ছাঁটা। লোকটা গ্রিক হতে পারে, কিংবা স্প্যানিয়ার্ড বা দক্ষিণ আমেরিকান। খয়েরি রঙের চোখ দুটো আশ্চর্য কঠিন। ছয় ফুটী অ্যাথলেটিক কাঠামো। প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা গ্যাবারডিন কোট পরে আছে, বোতাম খোলা থাকায় সাদা সিল্ক-শার্ট দেখা যাচ্ছে ভিতরে, টাইটা পোলকা-ডট। সব মিলিয়ে রানা ধারণা করল সুদর্শন একটা বাস্টার্ড, চাইলেই যত খুশি মেয়ে জোগাড় করতে পারে; সম্ভবত তাদেরকে নিয়েই বেঁচে আছে–বেশ আনন্দের সঙ্গেই।

বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠল মেয়েটি। খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'আপনার আরও সারধানে গাড়ি চালানো উচিত, কাউন্ট দুয়ার্তে। আপনার জানার কথা এই ড্রাইভ ধরে সব সময় স্টাফ আর বয়স্ক রোগীরা আসা-যাওয়া করে। আজ যদি এখানে এই ভদ্রলোক না থাকতেন,' রানার দিকে একবার ফিরে হাসল সে, 'আপনি আমাকে চাপা দিতেন। অথচ বড় একটা সাইনে পরিষ্কার লেখা রয়েছে এখানে খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে।'

'সত্যি দুঃখিত, মাই ডিয়ার। আমি একটু তাড়ার মধ্যে ছিলাম। ডক্টর কৃপানিধির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কিন্তু পৌঁছাতে দেরি করে ফেলেছি। বরাবরের মত আবার আমার ভেতর থেকে দূষিত পদার্থ বের করতে হবে, এবার সিঙ্গাপুরে দুই হপ্তা অসংযমী সময় কাটাবার পর।' রানার দিকে ফিরল সে। যেন অধস্তন কারও প্রতি খুশি হয়েছে, এরকম সুরে বলল, 'ধন্যবাদ, মাই ডিয়ার সার। আপনার রিফ্লেক্স খুব ভাল। এবার, আমাকে যদি ক্ষমা করেন–' একটা হাত তুলল সে, উঠে পড়ল মার্সিডিজে, সাঁ করে চলে গেল ড্রাইভ-ওয়ে ধরে।

মেয়েটি বলল, 'এবার আমাকেও ছুটতে হয়, ভয়ানক দেরি করে ফেলেছি।' দু'জন এক সঙ্গেই এগোল, মার্সিডিজের পিছু নিয়ে।

তাকে দেখছে রানা। জানতে চাইল, 'আপনি এখানে কাজ করেন?'

করে, জানাল মেয়েটি। কৃপানিধি হারবারিয়ামে তিন বছর হলো আছে সে। জায়গাটা তার ভাল লাগে। তা আপনার নাম কী? কতদিন থাকবেন এখানে? খুচরো আলাপ ভালই চলছে।

মেয়েটির শারীরিক কাঠামো আর হাঁটাচলার মধ্যে শক্তি আর দৃঢ়তা লক্ষ করল রানা, ধারণা করল হয়তো লন টেনিস খেলে। সুন্দরী না হলেও, সুশ্রী বটে; চোখে খোলামেলা একটা ভাব, আর হাসিটা খুব মিষ্টি। ঠিক যে ধরনের মেয়ে বিশেষ ভাবে পছন্দ করে রানা। তবে তার মুখের ভাবে কর্তৃত্বের ক্ষীণ একটু আভাস আছে, পুরুষদের জন্য যেটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে। ডক্টর কৃপানিধির মতই, সাদা আলখেল্লার মেয়েলি সংস্করণ পরেছে সে। তবে মোটেও ঢিলে-ঢালা নয়। স্তন আর নিতম্বের আকৃতি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে আলখেল্লার নীচে তেমন কিছু পরেনি সে। রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে কিনা। ছুটির সময়টা কীভাবে কাটায়।

মৃদু একটু হেসে, চট্ করে একবার মাপ নেওয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল মেয়েটি, খেলায় সময় দিতে পারবে সে।

'ছোট একটা গাড়ি আছে আমার, গ্রামের পথ ধরে একা-একা বহু দূরে চলে যাই। তা ছাড়া, রাজধানীর থিয়েটার আর স্টেডিয়াম পাড়াতে যাওয়া হয়। নতুন-নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে ভালই লাগে। কেউ কেউ সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং।'

'তাই? যেমন?'

'যেমন কাউন্ট আলফানসো দুয়ার্তে, ওই যে মার্সিডিজ চালিয়ে এলেন। প্রতি বছরই এখানে আসেন তিনি। ম্যাকাও, সিঙ্গাপুর, ইন্ডিয়া, লেবানন, কত দেশের কত বিচিত্র গল্পই না শোনান আমাদের। সিঙ্গাপুরে তাঁর বিরাট ব্যবসা আছে। আগে ছিল ম্যাকাও-এ। ভদ্রলোক পর্তুগিজ।'

আচ্ছা, ভাবল রানা। কাউন্টের নেপথ্যকাহিনী, যদি কিছু থাকে, জানতে পারলে মন্দ হয় না। ম্যাকাও থেকে ব্যবসা সরিয়ে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসার কারণ কী?

সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। উষ্ণ হলঘরের ভিতর থেমে মেয়েটি বলল, 'তো, এবার আমাকে ছুটতে হয়। আবার আপনাকে ধন্যবাদ।' এরপর রানাকে যে হাসিটা উপহার দিল, রিসেপশনিস্ট তাকিয়ে থাকায়, আবেগ আর উচ্ছ্বাস বর্জিত সম্পূর্ণ পেশাদারি। 'আশা করি আমাদের এখানে সময়টা আপনার আনন্দেই কাটবে।' ঘুরে হন-হন করে ট্রিটমেন্ট রুমগুলোর দিকে রওনা হলো সে।

তার পিছু নিল রানা, চোখ স্থির হয়ে আছে দোদুল্যমান ভরাট নিতম্বের উপর। হাতঘড়ির উপর একবার চোখ বুলাল ও, তারপর একই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল পরিচ্ছন্ন সাদা বেয়মেন্টে। অ্যারোসল ডিস্ইনফেকট্যান্ট আর অলিভ অয়েল-এর ক্ষীণ গন্ধ পেল বাতাসে।

'জেন্টেলমেন'স ট্রিটমেন্ট' লেখা একটা দরজার ভিতর ঢুকল রানা। ট্রাউজার

আর ফতুয়া পরা একজন ম্যাসার ওর দায়িত্ব নিল। কাপড়চোপড় খুলে কোমরে তোয়ালে জড়াল ও, লোকটার পিছু নিয়ে লম্বা একটা কামরায় ঢুকল, সেটা প্লাস্টিকের পার্টিশন দিয়ে ছোট-ছোট কমপার্টমেন্টে ভাগ করা।

প্রথম কমপার্টমেন্টে পাশাপাশি দু'জন বয়স্ক পুরুষ ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেট-বাথে শুয়ে আছে, তাদের বলিরেখায় ভর্তি গাল বেয়ে ঘামের ধারা গড়াচ্ছে।

পাশের কমপার্টমেন্টে দুটো ম্যাসাজ টেবিল দেখল রানা। একটায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে কম বয়েসী বিবর্ণ এক তরুণ। অসম্ভব মোটা সে, ম্যাসার-এর ব্যস্ত দুই হাতের নীচে তার চর্বিসর্বস্ব থলথলে শরীরটায় অশ্লীল ঢেউ তৈরি হচ্ছে। এ-সব দেখে বিতৃষ্ণায় কুঁকড়ে উঠছে মনটা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোয়ালে খুলে খালি ম্যাসাজ টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। শুরু হলো বেদম দলাইমলাই।

এ-ধরনের ম্যাসাজের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি রানার। স্নায়ুগুলো যেন নিজস্ব ভাষা ও সুর খুঁজে পেয়ে সঙ্গীত চর্চা শুরু করে দিয়েছে, রক্তে লেগেছে নাচের নেশা, ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছে পেশি, হাড়ের সঙ্গে পেশিকে বেঁধে রাখা শক্ত টিস্যু আর শিরা-উপশিরা। এ-সবের মধ্যে অস্পষ্টভাবে টের পেল রানা মেদবহুল তরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে টেবিল থেকে নেমে গেল, তার জায়গায় উঠল নতুন কোনও রোগী। ও শুনতে পেল ম্যাসার বলছে, 'আপনাকে দয়া করে হাতঘড়িটা খুলতে হবে, সার।'

মার্জিত, পরিশীলিত, শহুরে কণ্ঠস্বর কর্তৃত্বের সুরে প্রতিবাদ জানাল। গলার আওয়াজটা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল রানা। 'ননসেন্স, মাই ডিয়ার ফেলো। আমি এখানে প্রতি বছর আসি, কখনই হাতঘড়ি খুলতে রাজি হইনি। কিছু যদি মনে না করো, এবারও এটা কবজিতেই থাকবে।'

'দুঃখিত, সার।' ম্যাসারের কণ্ঠস্বর যথেষ্ট নম্র আর ভদ্র, তবে দৃঢ়ও বটে। 'তখন নিশ্চয়ই অন্য কেউ আপনার চিকিৎসা করেছে। আঙুল, তালুর উল্টোপিঠ আর হাতের বাকি অংশে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারছি ঘড়িটা রক্ত প্রবাহে বাধা দিচ্ছে। যদি কিছু মনে না করেন, প্লিজ, সার।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। অনুভব করছে রানা, নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে কাউন্ট দুয়ার্তে। তারপর অবিশ্বাস্য ক্রোধ আর হিংস্র গর্জনের সঙ্গে বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'খুলে নাও তা হলে!' 'কুত্তার বাচ্চা' শব্দ দুটো উচ্চারণ করার দরকার হলো না। বাক্যের শেষে বাতাসে ঝুলে থাকল সেটা।

'ধন্যবাদ, সার।' মুহূর্তের বিরতি, তারপর আবার শুরু হলো ম্যাসাজ।

ছোট্ট হলেও, ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল রানার। এ তো সবাই জানে যে ম্যাসাজ করাতে হলে হাতঘড়ি খুলতেই হবে। এই লোকের তা খুলতে না চাওয়ার কারণ কী? ব্যাপারটা নিতান্তই ছেলেমানুষি?

'চিং হন, প্লিজ, স্যর।'

হলো রানা। এখন মুখ আর মাথা নাড়াচাড়া করতে পারছে ও। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিজের ডানদিকে একবার তাকাল। কাউন্ট দুয়ার্তের মুখ উল্টো দিকে ফেরানো রয়েছে। তার ডান হাত ঝুলে রয়েছে মেঝের দিকে। রোদে পোড়ার দাগ যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক কবজির উপর সাদা চামড়ার ব্রেসলেট দেখা যাচ্ছে। যেখানে হাতঘড়িটা ছিল, চাকতির মাঝখানে, চামড়ার উপর লাল রঙের একটা চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে উল্কির সাহায্যে। একজোড়া বিদ্যুচ্চমকের ছাপ।

আচ্ছা, ভাবল রানা, কাউন্ট দুয়ার্তে তা হলে চায়নি এই উল্কি কেউ দেখুক। কেন? বিসিআই-এর রেকর্ড সেকশনকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখবে নাকি হাতঘড়ির নীচে এ-ধরনের উল্কি কারা ব্যবহার করে?

তিন

এক ঘণ্টা মেয়াদী চিকিৎসা শেষে রানার মনে হলো ভিতর থেকে সব কিছু বের করে নেওয়ার পর শরীরটাকে ওয়াশিং মেশিনে ফেলে আচ্ছামত ধোলাই করা হয়েছে। কাপড়চোপড় পরল ও, মনে মনে গাল দিচ্ছে বস্‌কে, দুর্বল ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সভ্য-ভব্য পরিবেশে।

মেইন লাউঞ্জে ঢোকার মুখে দুটো টেলিফোন বুদ। সুইচ বোর্ড অপারেটর হেডকোয়ার্টার ঢাকার একটা ল্যান্ডফোনের লাইন পাইয়ে দিল ওকে। বাইরের কোনও ফোন থেকে যোগাযোগ করার জন্য এই একটাই নম্বর দেওয়া হয়েছে রানাকে। ওর জানা আছে, বাইরে থেকে করা সব কলই মনিটর করা হয়।

হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ হতে রেকর্ডস-এর কারও সঙ্গে কথা বলতে চাইল রানা। লাইনে একটা ফাঁপা ভাব রয়েছে, বুঝল কোথাও মাইক্রোফোন লাগানো আছে।

রেকর্ডস-এর হেডকে নিজের নম্বর জানিয়ে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল রানা। সাবজেক্টের নাম কাউন্ট আলফানসো দুয়ার্তে, আগে ম্যাকাও-এ ব্যবসা করত, এখন করে সিঙ্গাপুরে, তবে পর্তুগালের লোক।

দশ মিনিট পর লাইনে ফিরে এলেন রেকর্ডস-এর হেড।

'বিদ্যুচ্চমকের জোড়া লাল দাগ একটা টং সাইন,' তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রচুর আগ্রহ। 'চিনা ছাড়া অন্য কারও কবজিতে এই উল্কি থাকা খুবই বিরল একটা ব্যাপার। রেড লাইটনিং টং চিনাদের একটা গোপন সোসাইটি। কয়েক যুগ হলো

এই সোসাইটি অস্তিত্ব হারিয়েছে। ব্যাঙ্ককে টং-এর উক্তি, তা-ও একজন পর্তুগিজের কবজিতে? খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।'

'ধন্যবাদ,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। চিন্তিত। ইন্টারেস্টিং তো বটেই! টং-এর নতুন সংস্করণ জন্ম নিয়েছে নাকি? কিন্তু পর্তুগিজ কাউন্ট কৃপানিধি হারবারিয়ামে কী করছে?

বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা। চোখের কোণে ধরা পড়ল পাশের বুদে কী যেন নড়ল। সরাসরি তাকাতেই দেখতে পেল ওর দিকে পিছন ফিরে ফোনের রিসিভার তুলছে কাউন্ট দুয়ার্তে। বলা কঠিন এটা তার অভিনয় কি না। হয়তো অনেকক্ষণ হলো বুদটায় রয়েছে। রানার কথা হয়তো আড়ি পেতে শুনেছে সে। তলপেটে পরিচিত শিরশিরে ভাব অনুভব করল ও; খুব সম্ভব বোকার মত বিপজ্জনক একটা ভুল করে বসেছে, এ তারই সঙ্কেত।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা। সাড়ে সাতটা বাজে। লাউঞ্জের ভিতর দিয়ে সান-পারলারে চলে এল, এখানে ডিনার পরিবেশিত হবে। লম্বা একটা কাউন্টারে থেমে মধ্যবয়স্কা এক মহিলাকে নিজের নাম বলল। তালিকায় চোখ বুলাল সে, তারপর একটা প্লাস্টিকের মগে গরম ভেজিটেবল সুপ ঢেলে ঠেলে দিল ওর দিকে। মগটা তুলল রানা। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাতে কাজ না হওয়ায় উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল, 'আর কিছু নেই?'

মহিলা হাসল না। শুকনো, কঠিন সুরে বলল, 'আপনি ভাগ্যবান। উপবাস শুরু হলে এ-ও তো পাবেন না। এখন প্রতিদিন দুপুরেও সুপ চাইলে পাবেন, আর বিকেল চারটের সময় পাবেন দুই কাপ চা।'

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। নির্দয়তা আর প্রহসনের প্রতীক মগটা নিয়ে জানালার পাশে ছোট্ট একটা কাফে টেবিলে বসল ও, পানির মত পাতলা সুপে চুমুক দিচ্ছে আর দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে সহ কয়েদীদের। শ্লথ, দুর্বল পায়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কামরার ভিতরে। অথর্ব, অক্ষম, বোঝাস্বরূপ মানুষদের জন্য সহানুভূতি জাগল ওর মনে। নিজের জন্যও—এখন তো তাদের দলেরই একজন ও।

সুপটা শেষ করে নিজের কামরায় ফিরে এল রানা, কাউন্ট দুয়ার্তের কথা ভাবছে, ভাবছে ঘুমটা ভাল হওয়া দরকার, তবে সবচেয়ে বেশি করে ভাবছে নিজের খালি পেটের কথা।

এভাবে দু'দিন চলার পর ভয়ানক হয়ে উঠল রানার অবস্থা। অল্প মাত্রার একটা মাথাব্যথা স্থায়ী হয়ে গেছে। চোখের সাদা জমিন প্রায় হলুদ হয়ে উঠেছে। জিভে জমেছে পুরু সর।

ওর ম্যাসার উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করল। এরকমই নাকি হওয়ার কথা। এ-সব

নাকি শরীর থেকে বিষাক্ত, দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার লক্ষণ। মানসিক আর শারীরিক নির্যাতনে কাহিল হয়ে পড়ায় রানা কোনও তর্কের মধ্যে গেল না। কোনও কিছুরই আর যেন কোনও গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব শুধু ব্রেকফাস্টের জন্য পাওয়া একটা মাত্র কমলালেবু আর গরম পানির, মগ ভর্তি গরম সুপ আর চায়ের, যে চায়ে ইচ্ছেমত গুড় ঢালে রানা–ডক্টর কৃপানিধি শুধু এই একটি বিষয়ে কোন রকম বিধি-নিষেধ আরোপ করেননি।

তৃতীয় দিন, ম্যাসাজ আর সিট্‌স্ বাথ-এর ধকল কাটাবার পর, 'অস্টিয়প্যাথিক ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড ট্র্যাকশন' নামে নতুন একটা প্রোগ্রামে অংশ নিতে হচ্ছে রানাকে। বেযমেন্টের নতুন একটা সেকশনে পাঠানো হয়েছে ওকে। বিষণ্ন মনে চুপচাপ মেনে নিচ্ছে সব। নির্দিষ্ট দরজাটা খোলার সময় ধারণা করল দৈত্যাকার কোন লোককে ওর জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে, ওকে ভয় দেখাবার জন্য সমস্ত পেশি ফুলিয়ে রেখেছে।

থমকে দাঁড়াল রানা। কাউচের পাশে ওর জন্য অপেক্ষা করছে সেই মেয়েটি, শিল্পা কী যেন নাম। প্রথমদিন দেখা হয়েছিল, তারপর তাকে আর কোথাও দেখেনি ও। নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করল, বলল, 'গুড লর্ড। এই কাজ করো তুমি?'

পুরুষদের এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে-অভ্যস্ত হলেও, এ ব্যাপারটায় একটু স্পর্শকাতর মেয়েটি। হাসল না সে। মৃদুকণ্ঠে, তবে জ্ঞানদানের সুরে বলল, 'দুনিয়ার শতকরা প্রায় বিশ ভাগ অস্টিয়প্যাথই মেয়ে। আপনার সব কাপড় খুলে ফেলুন, প্লিজ। স-ব, শুধু জাঙ্গিয়া ছাড়া।'

মজা পাচ্ছে রানা, কৌতুক বোধ করছে, নির্দেশ মেনে খুলে ফেলল সব। এরপর মেয়েটি তার সামনে এসে দাঁড়াতে বলল ওকে। ওকে ঘিরে চক্কর দিল সে, নির্ভেজাল পেশাদারি আগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা করছে শরীরটা। শুকনো ক্ষতগুলো সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে কাউচে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলল ওকে। তারপর শক্ত, মাপমত, নিপুণ আর অভ্যস্ত বাঁধনে শরীরটাকে আটকে নিয়ে টান আর মোচড় দিতে শুরু করল হাড়গুলোর জয়েন্টে, মট-মট আওয়াজ শুনে রানার মনে হলো সব বোধহয় ভেঙে ফেলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেল রানা, অত্যন্ত শক্তিশালী মেয়ে সে। পেশির সমষ্টি ওর শরীর, শিথিল করে দেওয়ায়, তার কাজ যেন অনেক সহজ হয়ে গেছে। আকর্ষণীয় একটি মেয়ে আর প্রায় বিবস্ত্র একটি পুরুষের সংযত সম্পর্ক খানিকটা বিক্ষুব্ধ করে তুলল রানাকে।

চিকিৎসার শেষদিকে পৌঁছে রানাকে সিধে হয়ে দাঁড়াতে বলল মেয়েটি। 'এবার আমার ঘাড়ের পেছনে এক হাতের আঙুলের ফাঁকে অপর হাতের

আঙুলগুলো ভরে শক্ত করে ধরে রাখুন।'

আদেশ পালন করল রানা। ওর চোখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে পেশাদারি মনোসংযোগ ছাড়া আর কিছু নেই। গায়ের জোরে রানার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে সে, বোঝাই যাচ্ছে লক্ষ্য হলো ওর কশেরুকা ছাড়ানো। তবে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবার জন্য আর কিছুর দরকার ছিল না রানার। ব্যাপারটা শেষ হতে, মেয়েটি নির্দেশ দিল, ওর ঘাড়ের পিছন থেকে হাত দুটো নামিয়ে নিক রানা।

তা তো নামালই না, উল্টে হাত দুটো আরও শক্ত করল রানা, তারপর তার মাথাটা নিজের দিকে ঝট্ করে টেনে নিয়ে চুমো খেল রাঙা ঠোঁটে। ঝপ্ করে মাথাটা নিচু করল মেয়েটি, রানার হাত গলে বেরিয়ে এসে সিধে হলো আবার, মুখ লাল হয়ে উঠেছে, রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। তার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা, বলল, 'সবই খুব ভাল, কিন্তু কাজটা না করে আমার কোন উপায় ছিল না। অস্টিয়প্যাথ হতে চাইলে কারও ঠোঁট এতটা লোভনীয় হওয়া ঠিক নয়।'

মেয়েটির চোখের রাগ একটু বোধহয় কমল। 'এর আগেও একবার এরকম ব্যাপার ঘটেছে, সেবার লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেয়া হয়েছিল।'

হেসে উঠল রানা। তারপর মেয়েটির দিকে এগোবার ভঙ্গি করল। 'নির্ঘাত ভাগিয়ে দেয়া হবে জানলে আবার আমি তোমাকে চুমো খাব।'

মেয়েটি বলল, 'ছেলেমানুষি করবেন না। নিজের জিনিস-পত্র তুলে নিন। আধ ঘন্টার ট্র্যাকশন,' গম্ভীর একটু হাসি দেখা গেল ঠোঁটে, 'আশা করা যায় আপনাকে শান্ত হতে সাহায্য করবে।'

ম্লান সুরে রানা বলল, 'বেশ, ঠিক আছে। শান্ত আমি থাকতে পারি, তবে এক শর্তে। পরবর্তী ছুটির দিন আমার সঙ্গে বেরুতে হবে তোমাকে।'

'সেটা আমরা ভেবে দেখব। নির্ভর করবে পরবর্তী চিকিৎসার সময় কেমন আচরণ করেন আপনি।' দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল মেয়েটি।

নিজের কাপড়চোপড় তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা, প্যাসেজ ধরে হেঁটে আসা এক লোকের সঙ্গে একটুর জন্য ধাক্কা লাগল না। লোকটা আর কেউ নয়, স্ল্যাকস আর রঙচঙে উইন্ডচিটার পরা কাউন্ট দুয়ার্তে। রানাকে গ্রাহ্যই করল না সে। মেয়েটির উদ্দেশে ভুরু নাচিয়ে হাসল, সামান্য মাথা নত করে বলল, 'জবাই হবার জন্যে ছাগল হাজির। আশা করি আজ তুমি খুব বেশি শক্তি অনুভব করছ না।' তার চোখে আগ্রহ আর প্রত্যাশার ঝিলিক লক্ষ করার মত।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি রেডি হন, প্লিজ। মিস্টার রানাকে ট্র্যাকশন টেবিলে শুইয়ে দিয়ে এখনই ফিরছি আমি।' প্যাসেজে বেরিয়ে এসে হন-হন করে হাঁটতে শুরু করল। তার পিছু নিল রানা।

ছোট একটা অ্যান্টিরুমের দরজা খুলল মেয়েটি। নিজের কাপড়চোপড় একটা চেয়ারে রাখতে বলল রানাকে। একটা প্লাস্টিক পরদা টেনে পার্টিশন তৈরি করল। পার্টিশনের ভিতরে একটা অদ্ভুতদর্শন সার্জিকাল কাউচ দেখল রানা, চকচকে লেদার আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। জিনিসটাকে একটুও পছন্দ হলো না ওর, সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে। গদি মোড়া তিনটে সেকশনের সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকটা স্ট্র্যাপ নাড়াচাড়া করছে মেয়েটি, তিনটেতেই বোধহয় চাকা লাগানো আছে।

কাউচের নীচে হোঁৎকা চেহারার একটা ইলেকট্রিক মোটর রয়েছে, তাতে আটকানো প্লেটে বলা হয়েছে এটা হলো 'হারকিউলিস মোটোরাইজড ট্র্যাকশন টেবিল'। গিঁটবহুল কয়েকটা রডের আকৃতি নিয়ে একটা পাওয়ার ড্রাইভ মোটর থেকে উপর দিকে উঠে এসে কাউচের গদি মোড়া তিন সেকশনে যুক্ত হয়েছে, শেষ প্রান্তগুলো টেনশন স্ক্রুতে আটকানো, স্ক্রুর সঙ্গে তিন সেট স্ট্র্যাপও জোড়া লাগানো। সামনের উঁচু অংশে একটা ডায়াল রয়েছে, যেখানে রোগীর মাথা থাকবে। ২০০ পর্যন্ত প্রেশার মাপা যাবে। ১৫০-এর পর সংখ্যাগুলো লাল। হেডরেস্ট-এর নীচে রোগীর ধরার জন্য হাতল। হাতলগুলোর লেদারে দাগ লক্ষ করে গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। সন্দেহ নেই ঘামের দাগ ওগুলো।

'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন এখানে, প্লিজ।' স্ট্র্যাপগুলো রানাকে পরাবার জন্য তৈরি হলো মেয়েটি।

জিদ ধরল রানা। 'উঁহুঁ। আগে বলো জিনিসটা কী। দেখে মোটেও ভাল লাগছে না আমার।'

ধৈর্য হারানোর সুরে মেয়েটি বলল, 'এটা স্রেফ একটা মেশিন, আপনার মেরুদণ্ডকে আকর্ষণ করার জন্যে। আপনার মেরুদণ্ডের হাড়ে সামান্য বিচ্যুতি আছে। এই চিকিৎসায় সেটা ঠিক হয়ে যাবে। কিছু আড়ষ্টতাও আছে। তাও কাটিয়ে উঠবেন। শুরু হলে দেখবেন মোটেও খারাপ লাগছে না। শুধু টান-টান একটা অনুভূতি। দেখবেন খুব আরাম লাগবে। বয়স্ক অনেক রোগী তো ঘুমিয়েই পড়েন।'

'ইনি ঘুমাবেন না,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'কতটুকু শক্তিতে তুমি আমাকে টানতে চাও? ওখানে কিছু ফিগার লাল কেন? যদি এমন হয়, বেশি জোরে টান পড়ায় আমি ছিঁড়ে দুই টুকরা হয়ে গেলাম? তখন কী হবে?'

বড় করে একটা শ্বাস টানল মেয়েটি। 'ছেলেমানুষি করবেন না, প্লিজ। হ্যাঁ, বেশি টান পড়ে গেলে সেটা তো অবশ্যই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। কিন্তু আপনার জন্যে মাত্র নব্বুই পাউন্ডে সেট করব আমি। পনের মিনিট পর ফিরে এসে দেখব কেমন লাগছে আপনার, আর তখন হয়তো বাড়িয়ে একশো বিশে তুলব। এবার

দয়া করে কাছে আসুন। ওখানে আমার জন্যে আরেকজন রোগী অপেক্ষা করছেন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউচটায় উঠে উপুড় হয়ে শুলো রানা, হেডরেস্টের গভীর গর্তে ঢুকিয়ে দিল নাক আর মুখ। লেদারের বাধা থাকায় ওর কণ্ঠস্বর ভোঁতা শোনাল, 'তুমি যদি খুন কর আমাকে, ভূত হয়ে আমি কিন্তু তোমার ঘাড় মটকাব!'

রানা অনুভব করল স্ট্র্যাপগুলো প্রথমে ওর বুকে, তারপর নিতম্বের চারধারে আঁটসাঁট হলো। বড়সড় ডায়ালটার পাশে রয়েছে কন্ট্রোল লিভার, মেয়েটি ঝুঁকে সেটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করায় তার স্কার্ট ঘষা খেলো রানার গালে।

মোটর যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলল। স্ট্র্যাপে টান পড়ল, তারপর ঢিল; এই টান, এই ঢিল। রানার অনুভূতি হলো দৈত্যাকার হাত টেনে লম্বা করছে ওকে। অদ্ভুত একটা বোধ, তবে অপ্রীতিকর নয় মোটেই।

বেশ কষ্ট করে মাথাটা একটু তুলতে পারল ও। ডায়ালের কাঁটা নব্বুইয়ের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার মেশিনটা গাধার ডাক অনুকরণ করে নরম আওয়াজ ছাড়তে শুরু করল, এটা হচ্ছে ছন্দবদ্ধ ট্র্যাকশন সৃষ্টির জন্য গিয়ারগুলোর পালা করে এনগেজ আর ডিজএনগেজ হওয়ার কারণে।

'ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ।' রানা শুনতে পেল প্লাস্টিক পরদা সরিয়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি, তারপর বাইরের দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। গালে নরম লেদারের ছোঁয়া উপভোগ করছে ও। বিরতিহীন একটা ছন্দের সঙ্গে টান অনুভব করছে মেরুদণ্ডে। মেশিনটার একটানা মৃদু গুঞ্জন সম্মোহিত করতে চাইছে ওকে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা মন্দ নয়। ধ্যাত্, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করা উচিত হয়নি ওর।

পনেরো মিনিট পর বাইরের দরজা ক্লিক করে উঠতে শুনল রানা। পরদা সরাবার আওয়াজ হলো।

'সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

রানার দৃষ্টি পথে মেয়েটির হাত দেখা গেল, লিভার ঘোরাচ্ছে। মাথাটা তুলল রানা। ডায়ালের কাঁটা একশো বিশের ঘরে ঠেকল। এবার টানগুলো সত্যিকার পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। মেশিনের আওয়াজও অনেক বেড়ে গেছে।

মেয়েটি ওর মাথার কাছে নিজের মাথা নামাল। আশ্বাসসূচক একটা হাত রেখেছে ওর কাঁধে। মেশিনের যান্ত্রিক কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। 'আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি।'

'ঠিক আছে,' সাবধানে বলল রানা। ওর শরীরটাকে খুব জোরে টানছে

মেশিন, তাতে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে চেষ্টা করছে ও। পরদা খসখস করে উঠল। বাইরের দরজা ক্লিক করল কিনা বোঝা গেল না, আওয়াজটা যান্ত্রিক শব্দদূষণে চাপা পড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে নতুন ছন্দের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যতটা পারা যায় পেশিতে ঢিল দিল রানা।

সম্ভবত মিনিট পাঁচেক পর গালের কাছে বাতাসের নড়াচড়া অনুভব করে চোখ মেলল রানা। ওর সামনে একটা হাত–কোনও পুরুষের হাত–ধীর আর নরম ভঙ্গিতে অ্যাকসেলারেটরের লিভারটার দিকে এগোচ্ছে। ওটা দেখছে রানা। প্রথমে বোকার মত। তারপর লিভারটাকে ধীরে ধীরে নীচে নামতে দেখে ঘাবড়ে গেল। পরমুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে উঠল স্ট্র্যাপগুলো ভয়ানক জোরে ওকে টান দিতে শুরু করায়। চেঁচিয়ে উঠল–কী বলছে নিজেও জানে না। গোটা শরীরে বিস্ফোরিত হচ্ছে তীব্র ব্যথা।

মরিয়া হয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করে আবার চিৎকার দিল রানা। ডায়ালের কাঁটা উঠে গেছে দুশোর ঘরে! মাথাটা খসে পড়ল আগের জায়গায়, ঘাড়ে শক্তি নেই। চোখে ঘামের তৈরি কুয়াশা, তার ভিতর দিয়ে দেখল লিভার ছেড়ে দিল হাতটা থামল ওটা, ঘুরল ধীরে ধীরে, ফলে সরাসরি ওর চোখের নীচে চলে এল কবজিটা কবজির ঠিক মাঝখানে জোড়া বিদ্যুচ্চমকের লাল উল্কি। শান্ত, নরম একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিস করল ওর কানে, 'আর কখনও তুমি নাক গলাবে না, খবরদার!'

তারপর মেশিনের বিরতিহীন গর্জন, স্ট্র্যাপগুলোর অনবরত হ্যাঁচকা টান আর নিজের চিৎকার ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকল না। প্রচণ্ড টানে শরীরটাকে যেন ছিঁড়ে দু'ভাগ করার চেষ্টা হচ্ছে। রানা অনুভব করল, ওর চিৎকারে আর কোনও জোর নেই। একসময় কোনও আওয়াজই থাকল না। ঘামের ধারা লেদার কুশন হয়ে টপ-টপ করে ঝরে পড়ছে মেঝেতে।

তারপর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল ওর পৃথিবী।

চার

তবে এ-ও ঠিক যে শরীর ব্যথার স্মৃতি বেশিক্ষণ ধরে রাখে না, মস্তিষ্ক আর স্নায়ু খুব তাড়াতাড়ি সব ভুলিয়ে দেয়। এটা কিন্তু মধুর স্মৃতি সম্পর্কে সত্যি নয়, যেমন–ভাল লেগে যাওয়া কোনও সেন্ট, কোনও খাবারের স্বাদ, একটা চুমোর

বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য। এ-সব প্রায় পুরোটাই স্মরণ করা সম্ভব।

শরীরে প্রাণের লক্ষণ ফিরে আসতে শুরু করেছে, আর সুযোগ পাওয়া মাত্র সতর্কতার সঙ্গে নিজের বোধ আর অনুভূতি পরীক্ষা আর যাচাই করে নিচ্ছে রানা। শরীর ছিঁড়ে যাচ্ছিল, ব্যথা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু কামনা করছিল গোটা অস্তিত্ব, অবাক কাণ্ড যে এখন সে-সব কষ্টের একটুও অবশিষ্ট নেই।

তবে গোটা মেরুদণ্ড তীব্র ব্যথায় টন-টন করছে, যেন লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়েছে ওটাকে। এ-ধরনের ব্যথার অনুভূতি ওর ধারণার মধ্যে আছে, ফলে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রচণ্ড যে ঘূর্ণি ওর শরীরের ভিতর ঢুকে প্রলয়কাণ্ড শুরু করেছিল, ভুলিয়ে দিয়েছিল ওর পরিচয়, সেটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। এ কী করে সম্ভব হলো? ঠিক কেমন ছিল সেটা? মনে করতে পারছে না রানা। শুধু জানে, অস্তিত্ব মাপার স্কেলের অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল ও।

মানুষের গলার অস্পষ্ট আওয়াজ এখন একটু স্পষ্ট হলো।

'কিন্তু আপনি টের পেলেন কীভাবে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে, মিস সনম?'

'আওয়াজটা, মেশিনের আওয়াজটা। সবেমাত্র একজন রোগীর চিকিৎসা শেষ করেছি আমি। কয়েক মিনিট পর আওয়াজটা কানে লাগল।'

বলে চলেছে মেয়েটি। প্রথমে সে ভেবেছিল অ্যান্টি রুমের দরজা খুলেছে কেউ। উদ্বিগ্ন হয়নি, তবে ব্যাপারটা কী দেখার জন্য চলে আসে সে। এসেই দেখল, সর্বনাশ! ইন্ডিকেটরের কাঁটা দুশোর ঘরে উঠে গেছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে লিভার নামায় সে, স্ট্র্যাপগুলো খোলে, ছুটে গিয়ে সার্জারি থেকে কোরামিন নিয়ে এসে হাতের ভেইনে একটা ইঞ্জেকশন দেয়–এক সিসি। পালস ভয়ানক ধীরে চলছিল। তারপর ডক্টর থানকুচি কৃপানিধিকে ফোন করে সে।

'দেখা যাচ্ছে সম্ভাব্য সব কিছুই আপনি করেছেন, মিস সনম,' ডক্টর কৃপানিধির কণ্ঠস্বরে সন্দেহ। 'বেশ বুঝতে পারছি এই মারাত্মক ঘটনার জন্যে আপনি দায়ী নন। খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে। মনে হয় আমাদের রোগীই কোনওভাবে লিভারটা নামিয়ে ফেলেছিলেন।'

'কিন্তু...'

'হয়তো নিজে নিজে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক,' মেয়েটিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ডক্টর কৃপানিধি। 'এর ফলে মারাও যেতে পারতেন তিনি। কোম্পানিকে ব্যাপারটা জানাব আমরা, তারা যাতে কোনও ধরনের সেফটি অ্যারেঞ্জমেন্ট ইনস্টল করে দিয়ে যায়।'

একটা হাত সাবধানে রানার কবজি ধরল, পালস দেখছে। ও ভাবল এবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন ডাক্তারের

কাছে যাওয়া দরকার ওর। সত্যিকার ডাক্তার হতে হবে তাকে, এ-ধরনের সবজি ব্যবসায়ী কেউ নয়।

আকস্মিক একটা রাগ গ্রাস করতে চাইল রানাকে। এর সবটুকুই দোষ ওর বসের। বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ফিরে রীতিমত হই-চই বাধিয়ে দেবে ও। প্রয়োজন হলে উর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে–চিফ অভ স্টাফ, প্রাইম মিনিস্টার। রাহাত খান বিপজ্জনক এক উন্মাদ, দেশের জন্য হুমকি। বাংলাদেশকে রক্ষা করা রানার দায়িত্ব। দুর্বল, আবেগ প্রসূত অযৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা মাথার ভিতর ঘূর্ণি সৃষ্টি করছে, মিশে যাচ্ছে কাউন্ট দুয়ার্তের লোমশ হাত, শিল্পা সনমের লোভনীয় অবয়ব আর ভেজিটেবল সুপের সঙ্গে। আবার চৈতন্য হারাবার লক্ষণ টের পাচ্ছে রানা। ডক্টর কৃপানিধির কণ্ঠস্বর ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো: 'স্ট্রাকচারাল কোন ড্যামেজ হয়নি। শুধু নার্ভের প্রান্তগুলো কিছুটা থেঁতলে গেছে। আর শক। এই কেসটার পুরো দায়-দায়িত্ব আপনি নিন, মিস সনম। রোগীর বিশ্রাম দরকার, উষ্ণতা দরকার, যত্ন দরকার। কী বলছি বুঝতে পারছেন তো?'

আবার যখন জ্ঞান ফিরল, রানা দেখল নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে ও, গোটা শরীরে আশ্চর্য এক আরামদায়ক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। ওর নীচে ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কিট-এর কোমল উষ্ণতা। পিঠে এক জোড়া সান-ল্যাম্পের আঁচ। বিশেষ একটা ছন্দে ওর গায়ে হাত বুলাচ্ছে কেউ, ঘাড় থেকে হাঁটুর পিছন পর্যন্ত –তার হাত দুটো সম্ভবত মখমলে মোড়া। এই আদর আর যত্ন প্রাণভরে উপভোগ করছে রানা।

'এরকম কতক্ষণ চলবে?' এক সময় ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

মেয়েটি নরম সুরে বলল, 'মনে হচ্ছিল আপনার জ্ঞান ফিরে আসছে। হঠাৎ করে আপনার চামড়ার রঙ বদলে গেল। কেমন বোধ করছেন?'

'দারুণ। আরও ভাল বোধ করব খানিকটা হুইস্কি খেতে পারলে।'

হেসে উঠল মেয়েটি। 'মিস্টার কৃপানিধি বলেছেন চিরতার পানি আপনার খুব উপকারে লাগবে। তবে আমি ভাবলাম সামান্য একটু উত্তেজক কিছু ভাল ফল দিতে পারে, মানে শুধু এই একবার। তাই সঙ্গে করে ব্র্যান্ডি নিয়ে এসেছি আমি। বরফ তো আছেই। সত্যি নেবেন খানিকটা? দাঁড়ান, আপনার গায়ে ড্রেসিং গাউনটা চাপাই, তারপর দেখুন চিৎ হতে পারেন কিনা। আমি অন্য দিকে ফিরে থাকব।'

ল্যাম্পগুলো সরিয়ে নেওয়ার আওয়াজ পেল রানা। ধীরে ধীরে কাত হলো ও। ভোঁতা ব্যথা ফিরে এল, তবে এরই মধ্যে অনেক কমে গেছে। সাবধানে পা

দুটো বিছানার কিনারা থেকে নীচে নামিয়ে দিয়ে উঠে বসল ও।

ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিল্পা সনম–পরিচ্ছন্ন, ফরসা, আন্তরিক, আকর্ষণীয়। এক হাতে ভারী মিঙ্ক গ্লাভ; তবে পিছনে নয়, তালুর দিকটায় ফার দেখা যাচ্ছে। অপর হাতে একটা গ্লাস। গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরেছে।

পান করার সময় অভয়দানকারী, বাস্তব দুনিয়ার প্রমাণস্বরূপ টুকরো বরফের আওয়াজ শুনছে রানা, ভাবছে, এরকম মেয়ে সাধারণত দেখা যায় না। আমার একে দিয়েই চলবে। সে আমাকে সারাদিন যত ইচ্ছে ম্যাসাজ করুক আর মাঝে-মধ্যে বেশ কড়া দু'এক ঢোক খেতে দিক। জীবনটা তা হলে ভারি উপভোগ্য হবে। তার দিকে তাকিয়ে হাসল ও, গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'আরও।'

হেসে উঠল মেয়েটি, যতটা না ওর আবদারে, তারচেয়ে ওকে পুরোপুরি জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখার স্বস্তিতে। গ্লাসটা নিল সে, বলল, 'বেশ, তবে এবারই শেষ। ভুলবেন না, আপনার পেট খালি। জিনিসটা আপনাকে ধরে বসতে পারে।'

ব্র্যান্ডির বোতলটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে শিল্পা।

'ভুলব না।'

হঠাৎ করে ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মেয়েটির চোখের দৃষ্টি। 'এবার মনে করতে চেষ্টা করুন, তারপর আমাকে বলুন কী ঘটেছিল। আপনি কি অ্যাক্সিডেন্টালি লিভারটা ধরে ফেলেছিলেন? আপনি আমাদের সবাইকে ভয়ানক আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন। এ-ধরনের কিছু আগে কখনও ঘটেনি এখানে। 'আমরা জানি, ট্র্যাকশন টেবিলটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

রানার চোখে-মুখে আন্তরিক একটা ভাব ফুটে উঠল। অভয় দেওয়ার সুরে বলল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আসলে আরেকটু আরাম পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপত্তিটা ঘটেছে। হাত আর মাথা তুলছিলাম, মনে পড়ছে শক্ত কিছু-একটার সঙ্গে বাড়ি খায় একটা হাত। এখন বুঝতে পারছি ওটা নিশ্চয়ই লিভার ছিল। তারপর আর কিছু মনে করতে পারি না। ভাগ্যটা আমার খুবই ভাল যে এত তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলে তুমি।'

রানার হাতে খানিকটা ব্র্যান্ডিসহ গ্লাসটা ফিরিয়ে দিল মেয়েটি। 'যাক, খারাপ সময়টা আমরা পার হয়ে এসেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কোথাও মারাত্মক টান পড়েনি। আরও দু'দিনের চিকিৎসায় বৃষ্টির মত নির্মল হয়ে উঠবেন আপনি।' একটু যেন বিব্রত দেখাল তাকে। 'ও, হ্যাঁ, ডক্টর কৃপানিধি জানতে চেয়েছেন এই যে আপনাকে ভুগতে হলো, গোটা ব্যাপারটা, আপনি চেপে রাখতে রাজি হবেন কিনা। তিনি চান না অন্যান্য রোগীরা উদ্বিগ্ন হন।'

সেটা তোমাদের ব্যবসার জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, ভাবল রানা। 'না, এটা বলে বেড়ানোর মত কোনও ব্যাপার নয়, কারণ সব দোষ তো আমারই,'

বলল ও। গ্লাসটা খালি করল। 'মার্ভেলাস লাগল, বুঝলে। এবার আরও খানিক্ মিল্ক ট্রিটমেন্ট হলে কেমন হয়? ভাল কথা, তুমি আমার বন্ধু হবে? আমার জীবনে তুমিই একমাত্র মেয়ে যে জানে কীভাবে একটা পুরুষের সেবা করতে হয়।'

আবার হেসে উঠল মেয়েটি। 'ছেলেমানুষি করবেন না। উপুড় হয়ে শোন দেখি। চিকিৎসা দরকার আপনার পিঠের।'

'সবই দেখছি জানো তুমি।'

দু'দিন পর আবার নেচার কিয়োর-এর অবাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এল রানা। খুব সকালবেলা শুধু গরম পানি খাও। একটু পর জ্যামিতিক আকৃতিতে কাটা শুধু একটা কমলালেবু। দুপুরে শুধু গরম সুপ। দিবানিদ্রা। উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটো। বাসে চড়ে কাছাকাছি চায়ের দোকানে গিয়ে গুড় দেওয়া তিন কাপ চা পান করো।

অবিশ্বাস্য, অসাধারণ ব্যাপার হলো, এর আগে এত ভাল কবে ছিল মনে পড়ছে না রানার। এমন নয় যে শক্তি অনুভব করছে, তবে ব্যথা-বেদনা বলতে কিছু নেই আর, চোখ আর চামড়া হয়ে উঠেছে পরিচ্ছন্ন, প্রতিদিন দশ ঘণ্টা ঘুম হচ্ছে, আর সবচেয়ে বড় কথা নিজের শরীরকে ধীরে-ধীরে ধ্বংস করে ফেলার অপরাধ বোধটা একদমই নেই।

গোটা ব্যাপারটা সত্যি খুবই অস্বস্তিকর। এর মানে কি ওর ব্যক্তিত্ব বদলে যাচ্ছে? ও কি নিজের ধার, অবস্থান আর পরিচয় হারিয়ে ফেলছে? ওর নির্বিকার, নিষ্ঠুর, লৌহকঠিন চরিত্রের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিছুটা অনৈতিক দিকগুলো কি ছেড়ে যাচ্ছে ওকে?

পরিবর্তিত হয়ে কীসে পরিণত হবে ও? নরম, ছাপোষা, স্বপ্নরাজ্যে বিচরণকারী, সদা আদর্শবান একজনে, যে স্বভাবতই বিসিআই ছেড়ে দিয়ে কোথাও পরিদর্শকের চাকরি নেবে, নিজেকে আগ্রহী করে তুলবে রাজনীতিতে, দাবী আদায়ের লক্ষ্যে মিছিলে অংশ নেবে, আমিষ ছোঁবে না, চেষ্টা করবে দুনিয়াটাকে যাতে আরও ভাল করা যায়?

যতই দিন যাচ্ছে, নেচার কিয়োর ততই দাঁত বসাচ্ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে রানার উদ্বেগ কিন্তু বাড়ছে না। তার কারণ ও উপলব্ধি করতে পেরেছে আগের জীবনের অবসেশনগুলো কখনোই ওকে ত্যাগ করবে না। পেট খালি তো কী হয়েছে, হোক নাগালেরও বাইরে, তবু ফাইভ স্টার হোটেলের সেরা সব খাবারের কথা ভাবতে নিজেকে বাধা দিচ্ছে না রানা; নিজের কাছে অস্বীকার করছে না শিল্পা সনমের বলিষ্ঠ, নিরেট, ভরাট আর সাবলীল শরীরটা পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড একটা ইচ্ছে কাহিল করে তুলছে ওকে, আর ভয়ানক মনোসংযোগের সঙ্গে উপায় খুঁজছে কীভাবে খামচে ধরে বের করে আনা যায় কাউন্ট দুয়ার্তের সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি।

তালিকার প্রথম দুটোকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে কাউন্ট দুয়ার্তে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে রানা আবার ওর চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার দিন থেকেই।

যেন যুদ্ধের সময় একজন শত্রু এজেন্টের বিরুদ্ধে লাগানো হয়েছে রানাকে, শীতল নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে ও। শিল্পার সঙ্গে গল্প করার সময় কৃপানিধি হারবারিয়ামের বিভিন্ন রুটিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করছে ও। প্রসঙ্গ ধরে প্রশ্ন করছে, 'তোমরা তা হলে লাঞ্চ করো কখন?' কিংবা, 'দুয়ার্তে না কী যেন নাম, তাকে এত ফিট লাগে কেন?'

শিল্পা হয়তো বলল, 'কাউন্ট দুয়ার্তে তাঁর কোমরের মাপ নিয়ে খুব চিন্তিত।'

'তা হলে তাকে বোধহয় ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কিট বাথ নিতে হবে, তাই না?'

মাথা নাড়ল শিল্পা। 'কাউন্টকে রোজ টার্কিশ বাথ কেবিনেটে ঢুকতে হচ্ছে। বিকেলের দিকে, দুপুরে ব্যবসার কাজ সেরে ফিরলেই।'

'কোথায় ওটা? চিনিয়ে দিয়ো তো। ঘাম ঝরাবার জন্যে আমিও না হয় যাব একবার।'

ধীরে ধীরে, সংগ্রহ করা তথ্যের সাহায্যে প্ল্যানটা তৈরি করছে রানা। এমন একটা প্ল্যান, যাতে সাউন্ডপ্রুফ ট্রিটমেন্ট রুমে কাউন্টের সঙ্গে একা থাকার সুযোগ হয় ওর।

সারাদিনই নিজের কামরায় থাকে কাউন্ট দুয়ার্তে, শুধু দুপুরবেলাটা বাদে। ওই সময়ে তার কামরায় ঢোকার চেষ্টা করে পরপর দু'দিন ব্যর্থ হলো রানা। প্রথমদিন প্যাসেজের দেয়াল রঙ করছিল মিস্ত্রীরা, তাদের সামনে আরেকজনের কামরায় ঢোকা বোকামি হত। দ্বিতীয় দিন, ভাগ্য খারাপ, নিজের 'ব্যবসা' দেখতে যায়নি দুয়ার্তে।

রুটিনটা অবশ্য বদলে গেল। দেখা গেল বাইরে বেরুলে রাত এগারোটার আগে ফিরছে না দুয়ার্তে। নাইট পোর্টার ঘুষ খেয়ে নিয়ম ভাঙে, গেট খুলে দেয় তাকে।

কিন্তু দীর্ঘ সময় পাওয়া সত্ত্বেও কাউন্টের কামরায় ঢুকতে পারছে না রানা। তার দরজার সামনে একজন পোর্টার সারাক্ষণ পায়চারী করে। সন্দেহ নেই টাকা খাইয়ে তাকে দিয়ে পাহারার কাজ করিয়ে নিচ্ছে কাউন্ট। অর্থাৎ কামরার ভিতর গোপন করার মত নিশ্চয়ই কিছু আছে।

কী করে লোকটা? প্রতিদিন কোথায় যায়? চিনা অপরাধীদের প্রাচীন সংগঠন টং-এর প্রতীক চিহ্ন কী কারণে এঁকে রেখেছে ও কবজিতে?

দুই হপ্তা পুরো হতে, অর্থাৎ শেষ দিন আসার আগেই সব চূড়ান্ত করে ফেলল রানা—স্থান, কাল, পাত্র ও পদ্ধতি।

সকাল দশটায় ফাইনাল চেক-আপের জন্য ডক্টর থানকুচি কৃপানিধির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রানার। কনসালটিং রুমে ঢুকে দেখল খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ডিপ-ব্রিদিং এক্সারসাইজ করছেন ডক্টর কৃপা। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে নাক দিয়ে ছোটখাট একটা ঝড় বের করলেন তিনি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল উদ্ভাসিত চেহারায় নীরবে 'বাহ্! চমৎকার!' ধরনের একটা ভাব ফুটিয়ে তুললেন। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়া হাসিতে একজন বন্ধুকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। 'এবার তা হলে বলুন, মিস্টার রানা, দুনিয়া আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করছে? দুঃখজনক সেই ছোট্ট অ্যাক্সিডেন্টটা কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না? না। ঠিক তাই। শরীরটা হলো দারুণ একটা মেকানিজম। সামলে ওঠার অসাধারণ ক্ষমতা এর। এবার দয়া করে শার্টটা খুলে ফেলুন, আমরা দেখি হারবারিয়াম আপনার জন্যে কী করতে পেরেছে।'

দশ মিনিট পর। ব্লাডপ্রেশার ১২০/৮০, ওজন আগের চেয়ে দশ পাউন্ড কম, অস্টিয়প্যাথিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, চোখ আর জিভ পরিচ্ছন্ন, অর্থাৎ নতুন একজন মানুষ হয়ে বেযমেন্টের ট্রিটমেন্ট রুমের দিকে শেষ চিকিৎসা নেওয়ার জন্য রওনা হলো রানা।

বরাবরের মতই সাদা কামরা আর করিডরগুলো নীরব হয়ে আছে, বাতাসে কোন গন্ধ নেই। আলাদা আলাদা কিউবিকল থেকে স্টাফ আর রোগীর দু'একটা কথার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। আর নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে কল-কল পানির শব্দ। ভেন্টিলেশন সিস্টেমের মৃদু গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। এখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। ম্যাসাজ টেবিলে শুয়ে রয়েছে রানা, কানে এল ওর শিকারের কর্তৃত্ব ফলানো কণ্ঠস্বর আর মেঝেতে দ্রুতগতি খালি পায়ের শব্দ। করিডরের শেষ মাথার একটা দরজা দীর্ঘশ্বাসের মত আওয়াজ করে খুলল আর বন্ধ হলো। 'মর্নিং, বারং। আমার জন্যে প্রস্তুত? আজ খুব গরম আর ভাল করে লাগাও। শেষ দিনের চিকিৎসা। তিন আউন্স কমাতে হবে। ঠিক?'

'ভেরি গুড, সার।' চিফ অ্যাটেনড্যান্টের জেম শ্যুর সঙ্গে খালি পায়ের আওয়াজটা আবার শোনা গেল, করিডর ধরে ম্যাসাজ রুমের প্লাস্টিক পরদাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল শেষপ্রান্তের কামরায়, অর্থাৎ ইলেকট্রিক টার্কিশ বাথে। একই ধরনের আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

কয়েক মিনিট পর আবার খুলল দরজা, কাউন্ট দুয়ার্তের ব্যবস্থা করে দিয়ে করিডর ধরে ফিরে যাচ্ছে চিফ অ্যাটেনড্যান্ট বারং।

বিশ মিনিট পার হলো। পঁচিশ মিনিটে গড়িয়ে টেবিল থেকে নেমে পড়ল রানা। 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ, কোথুয়া। তুমি দারুণ উপকার করলে আমার। সময় সুযোগ করে নিয়ে আবার তোমার কাছে আসতে হবে আমাকে।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, সার।'

'যাই তা হলে, শরীরে লবণ ঘষে স্টিম বাথটা সেরে নিই। আমাকে নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তুমি তোমার গাজর আর পেঁপে ভর্তা বানাবার কাজে যাও। গোসল হয়ে গেলে আমি নিজেই ফিরে যেতে পারব।'

তিন মিনিট পর কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। চারদিকে লোকজনের কথাবার্তা আর ব্যস্ত নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। রোগীদের ছেড়ে দিচ্ছে অ্যাটেনড্যান্টরা, স্টাফ ডোর দিয়ে নিজেদের স্টেশনে চলে যাচ্ছে লাঞ্চ খেতে।

করিডর ধরে চিফ অ্যাটেনড্যান্ট বারং-এর গলা ভেসে এল, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। 'জানালাগুলো, তুয়াং? ঠিক আছে। এরপর তোমার পেশেন্ট মিস্টার বব ফ্লিনটন, বেলা দুটোয়। থানি, লন্ড্রিকে জানিয়ে রাখো লাঞ্চের পর আরও তোয়ালে দরকার হবে আমাদের। বারি···বারি, কোথায় গেল সে? ঠিক আছে, কোথুয়া, তুমিই তা হলে কাউন্ট দুয়ার্তের দেখাশোনা করো। টার্কিশ বাথে আছেন উনি, মাঝে মধ্যে দেখে এলেই হবে। ঠিক আছে?'

এক হপ্তা ধরে এ-সব শুনছে রানা, লক্ষ করেছে ডিউটির সময় কিছুটা বাকি থাকতেই লাঞ্চ খেতে চলে যায় অ্যাটেনড্যান্টরা। খালি শাওয়ার রুমের খোলা দরজার সামনে থেকে কোথুয়ার ভারী কণ্ঠস্বর নকল করল রানা, 'ঠিক আছে, বস্।' তারপর মেঝেতে জেম শ্যুর পিচ্ছিল আওয়াজ শুনতে পেল। এই বার! দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ করে স্টাফ ডোর খুলল আর বন্ধ হলো। ফ্যানের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। ট্রিটমেন্ট রুমগুলো এখন সব খালি। দালানের এই অংশে একা শুধু রানা আর কাউন্ট আলফানসো দুয়ার্তে রয়েছে।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর শাওয়ার রুম থেকে বেরিয়ে এসে নরম হাতে টার্কিশ বাথের দরজাটা খুলল। এখানে একবার এসে একটা সেসন পার করেছে ও, জায়গাটার কোথায় কী আছে ধারণা পাওয়ার জন্য। যেমন মনে আছে তেমনই দেখল দৃশ্যটা।

অন্য সব ট্রিটমেন্ট রুমের মতই, এটাও সাদা একটা কিউবিকল; তবে এটায় একমাত্র জিনিস হলো বড় একটা ক্রিম কালারের মেটাল আর প্লাস্টিকের বাক্স, প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া। মাথার দিকটা ছাড়া সব দিক থেকে বন্ধ ওটার। বড়সড় কেবিনেটের সামনের অংশে কবজা লাগানো আছে, ফলে খোলা যায়–ওখান দিয়ে ঢুকে ভিতরে বসে রোগী। মাথার দিকে একটা গর্ত আছে–চিবুক আর ঘাড়ের পিছনটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ফোম রাবারসহ–যেটা দিয়ে রোগীর মাথা বাইরে বেরিয়ে থাকে। তার বাকি শরীর কেবিনেটের ভিতর অসংখ্য সারিতে বসানো নগ্ন ইলেকট্রিক বালবের আঁচে গরম হয়. তাপ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা

হয় কেবিনেটের বাইরে বসানো একটা ডায়ালের সাহায্যে। সাদামাঠা একটা ঘাম ঝরাবার মেশিন, জার্মানির বিখ্যাত এক কোম্পানির তৈরি।

কেবিনেটটা দরজার উল্টো দিকে মুখ করা। দরজার দীর্ঘশ্বাস শুনে খেপে উঠল কাউন্ট দুয়ার্তে। বলল, 'ধুত্তোর, বারং। এটা থেকে বের কল্লো আমাকে। ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছি।'

'আপনি না তখন বললেন গরম হওয়া চাই, সার?' জিজ্ঞেস করল রানা, চিফ অ্যাটেনড্যান্টের কণ্ঠস্বর ভালই নকল করছে।

'আবার তুমি তর্ক করছ? কী বলছি শুনতে পাচ্ছ না? এটা থেকে বের করো আমাকে।'

'রোগ-ব্যাধি দূর করার জন্যে উত্তাপের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার বোধহয় কোন ধারণা নেই, সার। উত্তাপ রক্তের অনেক দূষিত পদার্থ নষ্ট করে দেয়। আপনার মধ্যে রোগের যে-সব লক্ষণ দেখা গেছে, একটু বেশি উত্তাপ খুবই উপকার বয়ে আনবে।' বারং-এর বিপদ সম্পর্কে মোটেও উদ্বিগ্ন নয় রানা, স্টাফ ক্যান্টিনে সবার সামনে বসে লাঞ্চ খাওয়ার অকাট্য অ্যালিবাই দেখাতে পারবে সে।

'আমাকে তুমি লেকচার শোনাতে এস না, বারং। যা বলছি করো, এখান থেকে বের করো আমাকে।'

মেশিনটার পিছনে, ডায়ালটা চেক করল রানা। কাঁটাটা ১২০-এর ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। কতটুকু দেওয়া যায় লোকটাকে? ডায়ালে ২০০ ডিগ্রি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সবটুকু দিলে নির্ঘাত জ্যান্ত রোস্ট হয়ে যাবে। এটা স্রেফ শায়েস্তা করা, খুন নয়। সম্ভবত ১৮০ ডিগ্রিকে ভাল বদলা বলা যেতে পারে।

নব ঘুরিয়ে কাঁটাটাকে ১৮০-এর ঘরে তুলল রানা। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, সার, আধ ঘণ্টার সত্যিকারের উত্তাপ আপনাকে নতুন একজন মানুষে পরিণত করবে।' এরপর নিজের কণ্ঠস্বরে ফিরে এল রানা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'গায়ে যদি আগুন ধরে যায়, মামলা ঠুকে দিয়ো।'

ঘাম ঝরা মাথাটা ঘুরতে চেষ্টা করে পারল না। দরজার দিকে এগোল রানা। কাউন্ট দুয়ার্তে এখন সম্পূর্ণ নতুন সুরে কথা বলছে; মরিয়া, তবে নিয়ন্ত্রিত। শুকনো কাঠকাঠ গলায় বলল, ঘৃণা আর আক্রোশ চেপে রেখে, 'পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার দিচ্ছি, শোধবোধ হয়ে যাক।' দরজা খোলার হিসহিস শুনতে পেল। 'পঞ্চাশ হাজার। ঠিক আছে, বেশ, এক লাখ মার্কিন ডলার।'

নিজের পিছনে দৃঢ়তার সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা, দ্রুত পায়ে করিডর ধরে হাঁটছে। কাপড় পরে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে জরুরি আরও একটা কাজ সারতে হবে ওকে। একই পোর্টার প্রতিদিন পাহারা দেয় কাউন্ট

দুয়ার্তের কামরা, তাকে রানা মোটা টাকা বকশিশ দিয়ে শহরে পাঠিয়েছে একটা জিনিস কিনতে। বিকেলের আগে ফিরবে না সে। এই সুযোগে পর্তুগিজ কাউন্টের কামরাটা সার্চ করবে ও।

ওর পিছন থেকে ভেসে এল সাহায্য চেয়ে প্রথম চিৎকারটা, এত ভোঁতা যে কোনরকমে শোনা গেল। নিজের কান বন্ধ করে রাখল রানা। তবে প্রস্তাবটার কথা কোনমতেই ভুলতে পারছে না ও। না, শুনতে ভুল হয়নি ওর। এক লাখ ডলারই সেধেছে কাউন্ট দুয়ার্তে।

এক লাখ ডলার ঘুষ কে দিতে চায়? হয় অসম্ভব কোনও ধনী, নয়তো অবাধে বিচরণ করার জন্য মুক্ত থাকার জরুরি প্রয়োজন আছে যার। শুধু ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এত টাকা খরচ করতে চাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক।

সরু একটুকরো ইস্পাত আছে রানার কাছে, অনেকটা চুলের কাঁটার মত দেখতে, জাদুর কাঠি বলা যেতে পারে ওটাকে। ফাঁকা করিডরে দাঁড়িয়ে কী হোলে কাঠিটা ঢুকিয়ে পাঁচ-সাত সেকেন্ড নাড়াচাড়া করতেই খুলে গেল কাউন্ট দুয়ার্তের কামরার দরজা।

ভিতরে ঢুকে কবাট বন্ধ করে দিল রানা। সার্চটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে ওকে, কারণ যে-কোন মুহূর্তে কারও সাহায্যে নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারে কাউন্ট। ঘরের জানালা না খুলে আলো জ্বালল ও। প্রতিটি কামরার মত এখানেও ছোট একটা স্টিল-আলমারি দেখা যাচ্ছে। ওয়ার্ড্রোব, টেবিল-চেয়ার, সোফাও আছে। আলমারিটা জাদুর কাঠি দিয়ে খোলা গেল না। ভিতরে কী আছে কে জানে।

টেবিলের দেরাজে একটা ঢাউস আকৃতির মানিব্যাগ রয়েছে। টাকা খুব সামান্যই দেখল রানা, মেয়েদের ফটো আছে ডজনখানেক। ওয়ার্ড্রোবে পাওয়া গেল তিনটে সুট, চারটে টাই আর পাঁচ জোড়া জুতো। কাপড়চোপড়ের ভাঁজে একটা চাবিও পাওয়া গেল, পরিষ্কার বোঝা যায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরকম একটা চাবি রানার কাছেও যেহেতু আছে, জানে এটা দিয়ে কী খোলা যাবে।

খুলেও বিশেষ লাভ হলো না, কারণ একটা ব্রিফকেস ছাড়া আলমারিটা খালি দেখল রানা। ব্রিফকেস খোলা সম্ভব নয়, কমবিনেশন লক। তবে এ-ধরনের পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ও।

ধারাল একটা ছুরি বেরিয়ে এল ওর হাতে। ব্রিফকেসটা সাবধানে চিরে ফেলল ও।

প্রথমে পাওয়া গেল ক্রেডিট কার্ড-এর একটা বই। তারপর নগদ মার্কিন ডলার, দশ-পনের হাজারের কম নয়। দুটো পাসপোর্ট তার, একটায় বলা হয়েছে, কাউন্টের জন্ম পর্তুগালের লিসবনে; আরেকটায় লেখা রয়েছে, তার জন্ম চিনের

দ্বীপ-রাষ্ট্র ম্যাকাও-এ। দ্বিতীয়টা অনেক বছর আগে ইস্যু করা হয়েছে, পর্তুগালের কাছ থেকে মহা চিন তখনও নিজেদের ভূখণ্ড ফিরিয়ে নেয়নি।

তথ্য পেতে সাহায্য করবে রানাকে, এমন জিনিসও রয়েছে ব্রিফকেসে—ছোট একটা নোটবুক, একটা ম্যাপ আর আন্দামান দীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের একটা প্লেনের টিকিট।

নোট বুকটার পাতা উল্টে চোখ বুলাচ্ছে রানা, হঠাৎ ওর ব্রহ্মতালু গরম হয়ে উঠল।

পরিষ্কার ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—

'হংকঙে কিংবা সাংহাইয়ে একটা নিউক্লিয়ার বোমা ফেলার হুমকি দিলে বাপ-বাপ করে একশো বিলিয়ন ইউএস ডলার চাঁদা দিতে রাজি হবে বেইজিং।'

তারপর লিখেছে—

'নয়া দিল্লির কাছ থেকে আরও বেশি টাকা আদায় করা যাবে, কারণ প্রথমত, বোমা দুটো ওদের, দ্বিতীয়ত, আমরা নিয়ে আসার পর যদি অ্যাক্সিডেন্টালিও একটা ফেটে যায়, দ্বীপগুলোসহ ওদের মিসাইল ঘাঁটিটা স্রেফ ধুলো হয়ে উড়ে যাবে। এটা তারা চাইতে পারে না।'

'কমরেড "বারুদ বস্"কে অজস্র ধন্যবাদ, চিনা টং-এর অচিনা সংস্করণ হিসাবে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার দারুণ একটা প্ল্যান তৈরি করেছেন তিনি।'

পুরো লেখাটা রুদ্ধশ্বাসে পর-পর আরও দু'বার পড়ল রানা। ব্যাপারটার তাৎপর্য এত ভয়ঙ্কর, প্রতিটি শব্দ যেন ওর মাথার ভিতর ছাপা হয়ে গেল।

দ্রুত হাতে নোটবুকটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। পণ্যের তালিকা, ঠিকানাবিহীন লোকজনের নাম ইত্যাদি রয়েছে। ম্যাপটার ওপরও ভাল করে একবার চোখ বুলাল ও। তারপর সব ওখানে ফেলে রেখে দিয়ে ঘুরল, দরজার দিকে এগোচ্ছে। কারও চোখে ধরা না পড়ে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে ওকে। শুধু কাউন্ট দুয়ার্তের ঘর থেকে নয়, কৃপানিধি হারবারিয়াম থেকেও।

সাবধানে দরজা খুলে প্যাসেজে উঁকি দিল রানা। কেউ কোথাও নেই।

পাঁচ

দু'ঘণ্টা পর একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ডন মুয়াং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে চলে এল রানা। সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড আর পাসপোর্ট আছে. পরবর্তী ফ্লাইট ধরে পোর্ট ব্লেয়ারে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি; তবে তার আগে সব কথা জানিয়ে অনুমতি

নিতে হবে বিসিআই চিফ রাহাত খানের।

দ্বিতীয় সারির এমন একটা ফোন বুদে ঢুকল রানা, যেখান থেকে ডিপারচার লাউঞ্জের উপর নজর রাখা যায়। ওর ধারণা, অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য যে-লোক এক লাখ ডলার সাধে, অর্ধদগ্ধ অবস্থায়ও ফ্লাইট মিস করবে না সে।

রাহাত খানের ব্যক্তিগত একটা নাম্বারে ডায়াল করল রানা, নম্বরটা কোনও তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঢাকায় ইতিমধ্যে লাঞ্চ আওয়ার শেষ হয়ে গেছে, তারপরও অপরপ্রান্তে বস্ রিসিভার তুলছেন না দেখে অবাক হচ্ছে রানা। একটানা দশবার রিঙ হলো, অথচ সাড়া নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আবার ডায়াল করল ও। চিন্তিত হয়ে পড়ছে। দূর কাঁচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে ডিপারচার লাউঞ্জ ছাড়িয়ে খোলা রানওয়েতে।

দৃষ্টিসীমার মধ্যে দুটো প্লেন দেখা যাচ্ছে। একটা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং, সম্ভবত আন্দামান হয়ে চেন্নাই যাবে।

দ্বিতীয়টাও বোয়িং, তবে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের।

আরও পাঁচবার রিঙ বাজার পর রানার দুশ্চিন্তার অবসান হলো। বসের সেই ভারী আর ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও।

'ইয়েস?'

'এমআরনাইন, সার।'

'জরুরি মিটিঙে বসেছি, কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এসে তোমার কল রিসিভ করছি,' বসের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। 'যা বলবে সংক্ষেপে।'

শুরু করল রানা। সংক্ষেপেই সারল। মেসেজটার গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারলেন রাহাত খান। বললেন, 'বলো কী! ওদের তো দেখছি মহা বিপদ!'

'জী, সার।'

'শুধু ওদের বিপদই বা বলি কেন,' নিজের বক্তব্য শুধরে নিচ্ছেন বিসিআই চিফ, 'চিন বা ভারতে বোম পড়লে বাংলাদেশও তো ভাল থাকবে না!'

রানা অপেক্ষা করছে। আর ঠিক এই সময় কাঁচের ভিতর দিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জে এক লোককে ঢুকতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। প্রায় গোটা শরীর মোড়া তার সাদা ব্যান্ডেজে। তবে কীভাবে যেন হাঁটতে পারছে। একটা মেয়ে, সাদা ইউনিফর্ম বলে দিচ্ছে কোন্ ক্লিনিকের নার্স, হাত ধরে সাহায্য করছে তাকে। শারীরিক গঠন, হাঁটার ধরন আর ব্যান্ডেজ দেখে এক মুহূর্ত পরেই কাউন্ট দুয়ার্তেকে চিনতে পারল রানা।

রাহাত খান বললেন, 'আমি এমন একটা জরুরি মিটিং ফেলে এসেছি, এখনই

ফিরে না গেলেই নয়। আবার এই কাজটাও ফেলে রাখার মত না। ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে তুমিই যোগাযোগ করো, রানা। আমি একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি, সরাসরি ওদের চিফ মিস্টার বটব্যালের সঙ্গে কথা বলো তুমি। এটা একটা হট-লাইন।'

'ইয়েস, সার।'

'তাঁকে বলবে, প্রয়োজনে বিসিআই সব রকম সাহায্য করতে রাজি আছে।'

'জী, সার।'

'আর তার পরপরই চিনা ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গেও যোগাযোগ করো। ব্যাপারটা জানাও ওদেরকেও।'

'জী, সার।'

'উইশ ইউ গুড লাক, এমআরনাইন,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন বিসিআই চিফ।

আবার ডায়াল করছে রানা, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কাউন্ট দুয়ার্তের পিঠের উপর। ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে একটা টানেলে ঢুকছে সে। টানেলটা শেষ হয়েছে টারমাকের কিনারায়। ওখান থেকে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে প্লেনে উঠবে যাত্রীরা।

এটাও রানার লং ডিসট্যান্স কল। ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস-এর প্রধান ললিতমোহন বটব্যাল-এর সঙ্গে কথা বলবে ও।

দু'বার রিঙ হতেই রিসিভার তুলল কেউ। 'ইয়েস?' ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মার্জিত কণ্ঠস্বর।

'মাসুদ রানা, বিসিআই এজেন্ট। মিস্টার বটব্যাল?'

'ইয়েস,' একটু ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে জবাব দিলেন ভদ্রলোক। রানাকে তিনি ভাল করেই চেনেন, কিন্তু তাঁকে ওর ফোন করাটা এতই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যে সহজ হতে একটু সময় নিচ্ছেন। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রতিযোগিতা বা ক্ষেত্রবিশেষে শত্রুতা থাকেই। কে যে কখন কাকে কীভাবে নেবে আগে থেকে বলা কঠিন।

কোত্থেকে কেন ফোন করেছে সংক্ষেপে বলছে রানা।

মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হলো ওকে। মিস্টার বটব্যাল প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বলছেন কোথাও থেকে খবর পেয়েছেন আমাদের দুটো নিউক্লিয়ার বোমা চুরি বা ছিনতাই হবে?'

'হ্যাঁ।'

'এ-খবর কোথায় পেলেন আপনি?' অপরপ্রান্তে যেন একটা সিংহ গর্জে উঠল। 'কে জানাল আপনাকে? কখন জেনেছেন?'

রানা শান্ত এবং ঠাণ্ডা সুরে শুধু মনে করিয়ে দিল, 'মিস্টার বটব্যাল, আপনি চেঁচাচ্ছেন।'

'আই অ্যাম সরি,' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন ললিতমোহন বটব্যাল। রানা বুঝতে পারছে, যে-কোনও কারণেই হোক ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস চিফের নার্ভ ভয়ানক স্পর্শকাতর আর উত্তেজিত হয়ে আছে। 'আই অ্যাম রিয়েলি সরি, মিস্টার রানা। এখন, প্লিজ বলুন, আপনার খবরের সোর্স কী?'

কয়েক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'তার আগে আমাদের বোধহয় আপনার কুশলাদি জানা দরকার।'

মিস্টার বটব্যালও কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর বললেন, 'নিশ্চয় কোথাও ভুল বোঝাবুঝির একটা ব্যাপার ঘটেছে, মিস্টার রানা। খবরটা আপনি অনেক দেরিতে পেয়েছেন। আমি উত্তেজিত, অসুস্থ হয়ে আছি; তার কারণ বোমা দুটো পরশু ছিনতাই হয়ে গেছে।'

'ওহ্ গড!' অবাক হয়ে রানা দেখল টারমাক ধরে একদল যাত্রীর সঙ্গে ভারতীয় বোয়িং-এর দিকে নয়, সিঙ্গাপুরী বোয়িংটার দিকে এগোচ্ছে কাউন্ট দুয়ার্তে।

'এবার বলুন, মিস্টার রানা, আপনি এ খবর কোত্থেকে জানতে পারলেন?' ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস চিফ ললিতমোহন বটব্যালকে সন্দিগ্ধ মনে হলো। 'আমাদের মিডিয়া কিছু জানে না। সংশ্লিষ্ট আমরা অল্প কিছু লোক ছাড়া দুনিয়ার কেউ কিছু জানে না। অথচ আপনি...'

কোত্থেকে জেনেছে সংক্ষেপে বলল রানা। সবশেষে জানাল, 'যার কাছ থেকে জেনেছি তার যাওয়ার কথা ছিল রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে, কিন্তু আন্দামানে না গিয়ে এই মুহূর্তে সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের একটা ফ্লাইটে চড়ছে সে।'

'গোটা ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত, মিস্টার রানা। দু'দুটো নিউক্লিয়ার বোমা হারিয়ে দিল্লি নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে। কিন্তু পুলিশ, গোয়েন্দা, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, সিক্রেট সার্ভিস–সব অন্ধকারে, কেউ আমরা কিছু জানি না, কারও কাছে আধখানা সূত্র পর্যন্ত নেই, অথচ দেখা যাচ্ছে আপনি অনেক কিছু জানেন।'

'অনেক কিছু জানি বলা ঠিক হবে না...'

আবার রানাকে থামিয়ে দিলেন ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস চিফ। 'আপনি বিনয় করছেন, মিস্টার রানা। বেশ বুঝতে পারছি,' বললেন তিনি, 'ঈশ্বর সাহায্য করছেন ভারতকে। আপনি এত কিছু জেনেছেন, তারপর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, সবই ভগবানের কৃপায়। প্লিজ, মিস্টার রানা, হেলপ আস্!'

করবই। কিন্তু আগে জানতে হবে ঠিক কীভাবে কী ঘটেছে…'

'ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে আপনার একজন বন্ধু আছে–অনিল চ্যাটার্জি। মনে পড়ে?'

হেসে ফেলল রানা। অনিল চ্যাটার্জিকে মনে না পড়ার প্রশ্নই ওঠে না।* 'কোথায় সে?'

'কোলকাতায়,' বললেন বটব্যাল। 'ব্যাঙ্ককে আপনি কোন্ হোটেলে থাকবেন বলুন, আজকের ফ্লাইট ধরেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ও। কীভাবে কী ঘটেছে, সবই আপনি ওর কাছ থেকে জানতে পারবেন। ভাল কথা, আপনি যাতে এই কেসটায় আমাদেরকে সাহায্য করার অনুমতি পান, সেজন্যে জেনারেল রাহাত খানকে আজই আমি ফোনে অনুরোধ…'

'তার দরকার হবে না, মিস্টার বটব্যাল,' বলল রানা। 'তাঁর নির্দেশ পেয়েই এই নম্বরে আমি ফোন করেছি আপনাকে। বস্ আমাকে আগেই অনুমতি দিয়েছেন।'

'তাই? সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। সত্যি! এবং ধন্যবাদ, মিস্টার রানা, ফোন করে সব জানিয়েছেন বলে।'

'অনিলকে বলুন এয়ারপোর্টের কাছে সাম্পান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে পাবে আমাকে। এখানে আমার নাম, বাবুরাম সাপুড়ে। রিসেপশনকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে কত নম্বর স্যুইটে আছি আমি। রাখছি, মিস্টার বটব্যাল।'

যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

সিঙ্গাপুর।

বোটানিকাল গার্ডেনকে ছাড়িয়ে, হাজার আলোর মন্দির আর হাজিয়া ফাতিমাহ্ মসজিদের মাঝখানে জায়গাটা। প্রাচীন দুর্গের মত একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কপালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে 'বাসযোগ্য পৃথিবী চাই' নামে একটা এনজিও-র সাইনবোর্ড। এটাই আসলে বিলুপ্ত চিনা টং-এর অ-চিনা সংস্করণ। এনজিওর সাইনবোর্ড স্রেফ কাভার মাত্র।

আজ এই দুর্গে ওদের মাসিক মিটিং বসেছে। সভাপতিত্ব করছে মিস্টার এক্স। সে-ই এই নতুন ক্রাইম সিন্ডিকেটের লিডার। মিটিঙে অংশগ্রহণ করছে এশিয়ার বেশির ভাগ রাষ্ট্রের অপরাধী চক্রের লিডাররা। সব মিলিয়ে বিশজন তারা। 'বাসযোগ্য পৃথিবী চাই' আসলে তাদের একটি সমিতি, যেখানে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, রোজগারের নতুন পথ, পারস্পরিক সহযোগিতা, সংগৃহীত

---

* মাসুদ রানা সিরিজের 'বিদেশী গুপ্তচর' দ্রষ্টব্য।

সম্পদের বিলিবণ্টন, প্রয়োজনে আশ্রয়দান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে এক সময় প্রতিটি দেশে মাত্র একটি সংগঠনই থাকবে–বাসযোগ্য পৃথিবী চাই। ওটার অধীনে গোটা এশিয়ায় দুষ্কর্মের মহাপ্লাবন সৃষ্টি করবে তারা।

সমিতির চেয়ারম্যান মিস্টার এক্স-এর সঠিক পরিচয় খুব কম সদস্যই জানে। যারা জানে তারা তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে, অন্তত প্রকাশ্যে, তেমনি ভয়ও করে যমের মত। শ্রদ্ধাটা যদি না-ও হয়, ভয়টা নিঃসন্দেহে নির্ভেজাল। তার কারণও আছে।

ভারতে যতগুলো নিষিদ্ধ, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক দল আছে, অস্ত্র আর ট্রেনিঙের জন্য তাদেরকে একজনের কাছেই ধরনা দিতে হয়। বিহারের জনযুদ্ধের কাছে তার নাম ফোটে বাদশা, চারু মজুমদারের অনুসারী পশ্চিমবঙ্গের নক্সালপন্থীদের কাছে তার পরিচয় জগবন্ধু পাণ্ডে, উলফার কাছে বাঞ্ছারাম মাইতি, অসমীয়া লিবারেশন ফ্রন্ট তাকে চেনে ভানুরঞ্জন কুণ্ডু নামে; এইরকম ডজনখানেক নাম আছে তার গোটা ভারত জুড়ে। এখানেই শেষ নয়। নেপালের মাওবাদীরাও তার কাছ থেকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ কেনে, কেনে বাংলাদেশী জঙ্গিরা, থাইল্যান্ডের সন্ত্রাসীরা, বার্মার স্মাগলার আর রোহিঙ্গারা, এমনকী পাকিস্তানী মৌলবাদীরাও। হংকং, ম্যাকাও, তাইপে আর জাপানি এলাকার সংশ্লিষ্ট সবাই তাকে কমরেড বারুদ বস্ নামে চেনে।

তবে না, তার প্রকৃত পরিচয় কেউ জানে না।

শোনা যায় অস্ত্র আর গোলাবারুদের ব্যবসা করে দশ বছরে মিস্টার এক্স পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কামিয়েছে। তার সম্পর্কে আরেকটা গুজব হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলে, আর দুই বাংলার সুন্দরবনে তার নাকি প্রায় পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুকানো আছে।

বলাই বাহুল্য যে, অস্ত্রের অবৈধ ব্যবসাই মিস্টার এক্সের একমাত্র অপকর্ম নয়। ধর্ষক ও খুনি হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে সে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার সরকারী কর্মকর্তাদের স্ত্রী আর কন্যাদের উপর একবার চোখ পড়লে তাদের আর রক্ষে নেই। আরও অনেক স্যাডিস্ট-এর মত তারও বৈশিষ্ট্য হলো ধর্ষণ করার পর মেয়েটির স্তন কেটে, পেট চিরে, সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত করা; তারপর কেটে টুকরো টুকরো করে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া।

ভারত সরকার তাকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পাঁচ কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

এহেন স্বনামধন্য একজন ব্যক্তিকে সমিতির প্রধান নির্বাহী করতে পেরে এশিয়ার অপরাধ জগতের শিরোমণিরা যারপরনাই আনন্দিত। দুর্গের ভিতর,

সাউন্ডপ্রুফ কনফারেন্স রুমে শুরু হয়েছে সমিতির মাসিক মিটিং। বিশজন সদস্যের সবাই উপস্থিত। মিস্টার এক্স টেবিলের মাথায় বসে সভাপতিত্ব করছে।

কনফারেন্স টেবিলের চারধারে ত্রিশটা চেয়ার ফেলা হয়েছে। এগুলোর সবই লোহার বড়সড় চেয়ার, তবে গদি মোড়া। প্রতিবার মিটিঙের আগে চেয়ারগুলোর পিঠে ১ থেকে ২১ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা হয়। বাকি নয়টা চেয়ার সাধারণত খালি পড়ে থাকে। সদস্য ছাড়া মিটিঙে কাউকে ডাকা হলে তাকে ওই নয়টার একটায় বসতে দেওয়া হয়–সেটার পিঠে অবশ্যই তার নাম লেখা থাকবে। এই নয়টা চেয়ারের মধ্যে একটা চেয়ারকে ডেথ চেয়ার বলা হয়, তবে সেটা যে কোন্‌টা কেউ জানে না। কেউ যদি গোপনে সমিতির স্বার্থবিরোধী কাজ বা মিস্টার এক্সের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে, তার সংখ্যা লেখা হবে ওই ডেথ চেয়ারে।

ডেথ চেয়ারে বসলে মরতে হবে, এটা সবাই বোঝে, কিন্তু সেই মৃত্যু কীভাবে হবে তা কারও জানা নেই, কারণ আজ পর্যন্ত মিটিং চলার সময় কারও মৃত্যু দেখেনি তারা।

আজ মিটিঙে নতুন একজন লোক এসেছে, সে নাকি মিস্টার এক্সের ডান হাত। তাকে বসতেও দেওয়া হয়েছে নয়টা চেয়ারের একটায়, টেবিলের শেষ মাথায়, কিন্তু সেটা ডেথ চেয়ার কিনা তা কেউ জানে না। সদস্যরা এখনও জানে না কী কারণে লোকটার প্রায় গোটা শরীর সাদা ব্যান্ডেজে মোড়া।

মিটিঙের শুরুতেই মিস্টার এক্স ছোট্ট একটা ভূমিকা করল। 'প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি,' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল সে। তার সুদর্শন চেহারার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে সবাই। 'সভার কাজ আজ একটু দেরিতে শুরু হবে। তার আগে আমার একটা ব্যক্তিগত কাজ সেরে নিতে চাই। আশা করি ব্যাপারটা কারও কাছে একঘেয়ে বা বিরক্তিকর বলে মনে হবে না। অনুমতি দেন তো শুরু করি আমি।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল কনফারেন্স রুমে। সবাই বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি দিল।

এরপর মিস্টার এক্স তার ডান হাতের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি কাউন্ট আলফানসো দুয়ার্তে। ম্যাকাও-এ অপারেট করতেন, চিনা টং-এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন দশ বছর, গত দু'বছর আমার বিশেষ সহকারী হিসেবে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাজে আমি এত খুশি ছিলাম যে, গত বছর তাঁকে শুধু বোনাসই দিয়েছি পঞ্চাশ লাখ ডলার।'

প্রশংসাসূচক গুঞ্জন উঠল কমফারেন্স রুমে।

'কিন্তু।' দীর্ঘ বিরতি। 'বন্ধু, অংশীদার আর কর্মচারী, সবাইকে আমি বারবার

মনে করিয়ে দিই, আমাদের কাজে ভুলের কোনও স্থান নেই। গুরুতর ভুল কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।'

কামরার ভিতর পিনপতন নীরবতা নেমে এল।

'ক্ষমা করা যে যায় না, সে-কথা আমার প্রিয়ভাজন কাউন্ট আলফানসো দুয়ার্তেও জানেন্। অথচ তারপরও নিজের ভুল স্বীকার করেছেন তিনি আমার কাছে। শুধু তাই নয়, আমি তাঁকে আন্দামানের ফ্লাইট বাতিল করে এখানে চলে আসতে বললে বিনা দ্বিধায় চলেও এসেছেন। কেন?'

সদস্যরা কেউ নড়ছে না।

কাউন্ট দুয়ার্তের মুখে কাঁপা কাঁপা একটু হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না।

'কারণ কাউন্ট দুয়ার্তে জানেন, সারা দুনিয়ায় নিশ্ছিদ্র জাল বিছানো আছে আমার। যে যেখানেই পালাক, যত কাছে বা যত দূরে, আমার নাগালের বাইরে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

নীরবতা।

'মিস্টার এক্স,' থাইল্যান্ডের মাফিয়া বস্ থোনফালাও কুম্ভকর্ণ সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ডান হাত কাউন্ট দুয়ার্তের ভুলটা কী ছিল তা কি আমরা জানতে পারি?'

'আমার, আপনার, আমাদের সবার একজন কমন শত্রু আছে,' জবাব দিল মিস্টার এক্স, গম্ভীর। 'কী রকম? কেন সে আমাদের কমন শত্রু? কারণ, লোকটা ইনকোরাপটিব্ল্। তার নাম বললে সবাই আপনারা চিনবেন। কিন্তু আমার ডান হাত হয়ে কাউন্ট দুয়ার্তে এই নামটা শোনেননি। এটা তাঁর ভুল নয়, মারাত্মক একটা অপরাধ। নামটা হলো: মাসুদ রানা।'

কনফারেন্স রুমে চাপা উত্তেজনা আর উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল। ফিসফিস করছে সবাই।

'সাইলেন্স!' নির্দেশ দিল মিস্টার এক্স। 'একটা ক্লিনিকে ছিলেন কাউন্ট। সেখানে নেচার কিয়োর কোর্স নিতে আসে মাসুদ রানা নামে এক বাঙালী। এই রানা সেই রানা কিনা, এটা আমাকে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তবে তার মানে এই নয় যে কাউন্টের অপরাধকে ছোট করে দেখার অবকাশ আছে। কারণ তিনি আরও ভুল করেছেন।'

আবার নীরব হয়ে গেল কনফারেন্স রুম।

'ওই রানা নামের লোকটার সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়ায় জড়ান তিনি। তার ফলাফল আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন–ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়েছে সারা গা। শুধু তা-ই নয়, তিনি তাকে সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁর কামরায় ঢুকে সার্চ করার। এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ, ঘটনাটা তিনি চেপে গেছেন আমার

কাছে। কিন্তু তাঁর ভাবা উচিত ছিল। ভাবা উচিত ছিল যে আমি আমার ডান হাতের ওপর নজর না রেখে পারি না।'

সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। এরপর কী?

'ওই ক্লিনিকে আমার চর ছিল। সে এই ঘটনা রিপোর্ট করেছে আমাকে। দুঃখজনকই বলতে হবে, ওই চরকেও শাস্তি না দিয়ে উপায় নেই আমার। কারণ সে-ও মস্ত একটা বোকামি করে বসেছে। রানা লোকটা মোটা বকশিস দিয়ে তাকে একটা জিনিস কিনতে শহরে পাঠায়, সে-ও বোকার মত রাজি হয়ে যায়। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্লিনিকে ফিরে আসে সে, তবে ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে–কাউন্টের কামরা সার্চ করে ক্লিনিক থেকে চলে গেছে সেই রানা। সার্চ করে সে কী পেয়েছে বা কী পায়নি, আমরা জানি না। কাউন্ট বলছেন, কিছুই পায়নি। কে জানে উনি সত্যি বলছেন কিনা।'

বিরতি।

'কাউন্ট দুয়ার্তে। নিজের পক্ষে আপনার কি কিছু বলার আছে?' জিজ্ঞেস করল মিস্টার এক্স।

হেসে উঠল কাউন্ট দুয়ার্তে। সবাই অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে একজন মানুষ হাসে কী করে! তারপর ব্যাপারটা বোঝা গেল।

না, কাউন্ট দুয়ার্তে পাগল হয়ে যায়নি। সে আসলে হাসছেও না। ওটা তার কান্নার আওয়াজ।

'এটাও তাঁর একটা অপরাধ বলে ধরছি আমি, এই কান্নাটা। যে কাঁদতে পারে, আমাদের পেশায় আসার বা থাকার কোনও অধিকার নেই তার।' টেবিলের নীচে হাত গলিয়ে দিল মিস্টার এক্স। এক জোড়া সুইচ ঠেকল হাতে। চাপ দিল সে একটায়।

চেয়ারের হাতল আর পায়া থেকে কয়েকটা লোহার বাহু বেরিয়ে এসে পেঁচিয়ে ধরল কাউন্টের হাত, বুক, আর পা। তাজ্জব হয়ে ওগুলো দেখছে কাউন্ট।

আরেকটা বোতামে চাপ দিল মিস্টার এক্স।

তিন হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো কাউন্টের শরীরে। শিরদাঁড়া এমনভাবে বেঁকে গেল, কেউ যেন তার পিঠে লাথি মেরেছে। তার সোনালি চুল খাড়া হয়ে যাওয়ার পর নামছে না আর। চোখে যেন প্রচণ্ড রাগ ফুটল, তারপরই নিষ্প্রভ হয়ে গেল। চুল আর মাংস পোড়ার কটু গন্ধে ভরে উঠল লম্বা কামরাটা। হাঁ হয়ে গেছে মুখ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে কালো হয়ে ওঠা জিভ একটু একটু করে ঝুলে পড়ছে। হাতের তালু, পিঠের মধ্যভাগ আর ব্যান্ডেজের বিভিন্ন অংশ থেকে অল্প-অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সুইচ থেকে আঙুল সরিয়ে নিল মিস্টার এক্স। কামরার আলো নিস্তেজ হতে

হতে ম্লান কমলা হয়ে উঠেছিল, এখন আবার আগের মত উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে। পোড়া গন্ধটা অসহ্য হয়ে উঠেছে এবার। কাউন্টের শরীর ভয়ানক ভাবে কুঁকড়ে গেছে। ঠক্ করে একটা আওয়াজ হলো, লাশের চিবুক আঘাত করেছে টেবিলের কিনারায়– সবাই বুঝল, সব শেষ।

মিস্টার এক্সের নরম কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'সভার কাজ এক ঘণ্টার জন্যে মুলতবি করা হলো। আবর্জনা সাফ করা হয়ে গেলে আবার বসব আমরা। আমাদের সবার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে–সফল হয়েছে অপারেশন আন্দামান। একটা নয়, দু'দুটো ভারতীয় নিউক্লিয়ার বোমা এখন আমাদের দখলে। চলুন, প্লিজ, পাশের কামরায় ডিনার পরিবেশিত হয়েছে। পানাহার শেষে সফল অপারেশনের রিপোর্ট পড়ে শোনাব আমি আপনাদেরকে।'

ব্যাঙ্কক। হোটেল সাম্পান ইন্টারন্যাশনাল।

রানা এজেন্সির ব্যাঙ্কক শাখা থেকে সংগ্রহ করা জাল পাসপোর্টে নিজের ছবি বসিয়ে নিয়েছে রানা, নামের জায়গায় লিখেছে বাবুরাম সাপুড়ে, পেশা: জাত-সাপ ইমপোর্ট করা। ফাইভ স্টার হোটেলের একটা স্যুইটে উঠেছে ও। সম্ভবত ঘণ্টা কয়েকের বেশি এখানে থাকা হবে না, খুব বেশি হলে আজকের রাতটুকু।

অনিল পৌঁছে গেছে; দেখা যাক সে কী বলে। ক্লোজ-সার্কিট-টিভির স্ক্রিনে চোখ রেখে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে রানা। আগের চেয়ে সামান্য মুটিয়ে গেছে অনিল। বেশভূষায় আড়ম্বর একটু যেন বেশি। মাথা ঝাঁকাল ও। তারপর ভাবল, এটা অনিলের কাভার বা ক্যামোফ্লেজও হতে পারে।

নক হতে দরজা খুলতে যাচ্ছে রানা, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে নিল প্যান্টের নীচে, তলপেটের কাছে, বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো হোলস্টারে গোঁজা প্রিয় ওয়ালথারটা। পাসপোর্টের সঙ্গে এটাও ওর এজেন্সি থেকে পেয়েছে ও। কবাট খুলল রানা, জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। 'হ্যালো, অনিল! মাসীমা'র শরীর কেমন?'

'ভাল।' কামরার ভিতরে ঢুকে নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল অনিল চ্যাটার্জি। 'কেমন আছ, রানা?' স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করল সে। 'অনেকদিন পর দেখা।'

দুজনেই বহুকাল ধরে এসপিওনাজ জগতের বাসিন্দা, কাজেই পরিস্থিতির গুরুত্ব পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হলো না। দেখা গেল দেড় মিনিটের মধ্যে কুশলাদি বিনিময় শেষ করে কাজের কথায় ডুবে গেছে ওরা।

'ঠিক কী ঘটেছে খোলাখুলি বলো আমাকে। ভাইটাল পয়েন্ট একটাও বাদ দিয়ো না,' বলল রানা। 'তার আগে বলো কী খাবে, চা না কফি?'

'চা,' বলে সোফার মধ্যে নড়েচড়ে বসে শুরু করল অনিল।

পাঞ্জাবের লুধিয়ানা এয়ার ফোর্স বেস থেকে পাঁচজন ক্রু আর একজন

অবজারভার সহ বিশেষ ভাবে মডিফাই করা একটা মিগ-২৯ ফুলক্রাম ট্রেনিং ফ্লাইটে টেক অফ করেছিল গত পরশু সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময়। ওই মিগে লঞ্চিং মিসাইলসহ দুটো নিউক্লিয়ার বোমা ছিল। পনেরো শো মাইল দূরে অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দারাবাদে পৌঁছাবার কথা ওটার, ওখানকার এয়ার-ফোর্স বেসের আকাশে তিনটে চক্কর দিয়ে আবার ফিরে আসবে লুধিয়ানায়। সাত ঘণ্টা ওড়ার মত যথেষ্ট ফুয়েল ছিল মিগে। এত ওজন সত্ত্বেও ওটার গতি, ৪০০০০ হাজার ফুট উঁচুতে, ঘণ্টায় ৫০০ মাইল।

রওনা হলো ঠিকই, কিন্তু হায়দারাবাদে পৌঁছায়নি মিগটা। ফেরেনি লুধিয়ানাতেও। টেক অফ করার ঘণ্টাখানেক পর রেইডার থেকে সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে যায় ওটা।

একজোড়া বোমাসহ বোমারুতে রূপান্তরিত করা মিগ-২৯ ফুলক্রাম নিখোঁজ হয়েছে, এই খবর প্রথমে জানতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সেদিন দুপুর ঠিক বারোটায় তাঁর সরকারী বাসভবনে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে একটা এনভেলাপ পৌঁছায়। তাতে লেখা ছিল: 'পার্সোনাল অ্যান্ড মোস্ট ইমিডিয়েট।' এর নীচে ছিল প্রধানমন্ত্রীর নাম ও ঠিকানা।

এনভেলাপের ভিতর একটা চিঠি পাওয়া যায়। অনিল সেই চিঠির ফটোকপিটা দিল রানাকে। রানা পড়ল: 'বোমা দুটো সহ বোমারুটিকে হাইজ্যাক করা হয়েছে। বোমারুটি মিগ-২৯, আর বোমা দুটোর মডেল ও নম্বর... । ক্রু আর অবজারভাররা কেউ বেঁচে নেই। ব্যাপারটা গোপন রাখার ইচ্ছে থাকলে ওদের আত্মীয়স্বজনকে জানান প্লেনটা ক্র্যাশ করায় মারা গেছে তারা।

'প্লেনটা কোথায় আছে, বোমা দুটো সহ কীভাবে সেটাকে উদ্ধার করা যাবে, সবই আপনাদেরকে জানান হবে দুশো বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে। এই টাকা সোনায় চাই আমরা। সংযুক্ত-পত্রে ডেলিভারি দেওয়ার পদ্ধতির বর্ণনা পাবেন। আরও দুটো শর্ত হলো, সোনার বার-এ কোন বিশেষ চিহ্ন থাকা চলবে না, এবং এই কাজে আমরা যারা জড়িত তাদের প্রতি নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণা করতে হবে আপনার ও প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে।

'এ-সব শর্ত মেনে নিতে ব্যর্থ হলে সাত দিন পর, অর্থাৎ চলতি মাসের দশ তারিখ বিকেল ঠিক পাঁচটায় মেইনল্যান্ডের কোথাও একটা বোমা ফাটিয়ে কমপক্ষে দুশো বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ জান-মাল ধ্বংস করা হবে। বলাই বাহুল্য এটা অনাবশ্যক প্রাণহানি। এই ওয়ার্নিং-এর পরেও যদি আমাদের দাবি পূরণ করা না হয়, তা হলে আর কোন নোটিস ছাড়াই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় বোমাটা দিয়ে একটা ভারতীয় মেগাসিটিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরকালের জন্য গায়েব করে দেওয়া হবে। মানুষ মারা যাবে লাখ-লাখ। সংখ্যাটা

কোটিও ছাড়াতে পারে। আর সেজন্য দায়ী থাকবেন আপনি ও আপনার সরকার।

'এটাই, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, আমাদের তরফ থেকে প্রথম এবং শেষ যোগাযোগ। আপনার জবাবের জন্য ১৬ মেগাসাইক্‌ল্‌ ওয়েভ ব্যান্ডে সারাক্ষণ কান পেতে অপেক্ষা করছি আমরা।'

নীচে লেখা হয়েছে: 'বাসযোগ্য পৃথিবী চাই'-এর পক্ষে মিস্টার এক্স।

বেয়ারা দরজায় টোকা দিয়ে চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল। চা খেতে খেতে সংযুক্ত কাগজটার লেখাগুলো পড়ল রানা।

'নেপালের হিমালয় অংশে, এভারেস্টের পুব ঢালে, প্লেন থেকে প্যারাশুটে বেঁধে ফেলতে হবে সোনাভর্তি প্যাকেট। থালার মত প্রকাণ্ড চাঁদ ওঠার পর, স্থানীয় সময় রাত বারোটায়। এক ফুট পুরু ফোম রাবারে মোড়া থাকবে প্যাকেটগুলো। প্রতিটি প্যাকেট সিকি টন ওজনের হবে। প্রতি ফ্লাইটে তিনটের বেশি প্যাকেট ফেলা যাবে না। অপারেশন শুরু করার চব্বিশ ঘণ্টা আগে ১৬-মেগাসাইকেল ওয়েভ ব্যান্ডে জানিয়ে দিতে হবে কী ধরনের প্লেন কখন রওনা হবে।

'কোনও রকম কৌশল করার চেষ্টা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ—এক বা দুই নম্বর নিউক্লিয়ার ওয়েপন ডেটোনেট করব আমরা।'

টাইপ করা নামটা একই লোকের। দুটো কাগজেরই শেষ লাইনে বলা হয়েছে: 'রেজিস্টার্ড এয়ারমেইলে কিছু টাকা চেয়ে প্রায় একই বক্তব্যের একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে মহাচিনের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও। দুটো চিঠিই প্রাপকের কাছে পৌঁছবে একই সময়ে।'

মুখ তুলল রানা। 'তোমরা জানো এর সঙ্গে বেইজিঙের কী সম্পর্ক?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অনিল। 'কেউ আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ওরা তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল অনিল। 'সেজন্যে আরেকটু উষ্ণ সম্পর্ক দরকার না?'

'এটা পরিষ্কার ব্ল্যাকমেইলের কেস,' বলল রানা। 'যাই হোক, এবার বলো, তোমরা কতটুকু কী জানো।'

'বলতে গেলে কিছুই জানি না। বাসযোগ্য পৃথিবী চাই নামের কোনও সংগঠনের কথা আগে কেউ শোনেনি। চিঠিতে বোমা দুটোর যে মডেল আর সিরিয়াল নম্বর লেখা হয়েছে, সব নির্ভুল। অবজারভার হিসেবে একজন রুশ টেকনিশিয়ান ছিল প্লেনে—মডিফাই করার পর মিগ-২৯ ছয়শো মাইল স্পিডে কী আচরণ করে চাক্ষুষ করার জন্যে।'

'নিশ্চয়ই ক্রুদের কেউ সাহায্য করেছে কাজটায়,' বলল রানা। 'পাইলট সম্পর্কে কী জানো বলো।'

'অত্যন্ত দক্ষ পাইলটকে দিয়ে ট্রেনিং ফ্লাইট চালানো হয়। লোকটার নাম

কৃষ্ণকান্ত তিওয়ারি, রাশিয়ায় ট্রেনিং নিয়েছে। আমরা তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে দেখছি।'

'মিগ-২৯ ল্যান্ড করাতে হলে বড়সড় রানওয়ে দরকার...'

'তা দরকার,' বলল অনিল, মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে, কিছুটা উদভ্রান্ত লাগছে তাকে। 'এই চিঠি পাবার পর থেকে ছয় হাজার মাইলের মধ্যে যত এয়ারপোর্ট আছে সবগুলোতে খোঁজ নিচ্ছি আমরা। এমনকী কোথাও কোনও প্লেন ক্র্যাশ করেছে কিনা...'

'ক্র্যাশ করলে বোমাগুলো ফেটে যাবে না?'

'না। যতক্ষণ আর্ম করা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ ওগুলো। এমনকী কোনও প্লেন থেকে সরাসরি একটা বোমা নীচে পড়ে গেলেও ফাটবে না। দিল্লিতে এরকম একটা বোমা একবার পড়েছিল, তাতে শুধু টিএনটি ফেটেছিল। প্লুটোনিয়াম নয়।'

'ব্ল্যাকমেইলাররা তা হলে ওগুলো ফাটাবে কীভাবে?'

'আমার বস্, মিস্টার ললিতমোহন বটব্যাল ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। যা বুঝেছি বলছি তোমাকে। বোমার নাকে সাধারণ টিএনটি ভরা হয়েছে, আর প্লুটোনিয়াম ভরা হয়েছে লেজের দিকে। টিএনটি আর প্লুটোনিয়ামের মাঝখানে একটা গর্ত আছে, ওখানে তুমি স্ক্রু দিয়ে ডেটোনেটর—এক ধরনের প্লাগ— ফিট করবে। বোমাটা যখন পড়বে, টিএনটিকে ইগনাইট করবে বোমার নাকে বসানো সাধারণ ডেটোনেটর, আর টিএনটি ইগনাইট করবে প্লুটোনিয়ামকে।'

'তার মানে ফাটাতে হলে ওদেরকে বোমাগুলো আকাশ থেকে ফেলতে হবে?'

'না, তা নয়। ফিজিক্স সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে এমন একজন লোক দরকার হবে ওদের। ব্যাপারটা তার জন্যে সহজ। তাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না, বোমার নোজ কোন্-এর স্ক্রু খুলবে সে। ওখানে আছে সাধারণ ডেটোনেটর, শুধু টিএনটিকে ইগনাইট করার জন্যে। নোজ কোন্-এর বদলে কোনও ধরনের টাইম ফিউজ বসাবে সে, অথবা রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস, যেটা পতন ছাড়াই ইগনাইট করবে টিএনটিকে। ব্যস, হয়ে গেল, এতেই ফেটে যাবে বোমা।'

'কত মেগাটন?' জানতে চাইল রানা, খেয়াল করছে এ-প্রসঙ্গে কিছুই ওকে জানানো হচ্ছে না।

'কত মেগাটন, এটা এমনকী আমাকেও বলা হয়নি,' বলল অনিল। 'তবে খুব বিরাট কিছু নয় ওগুলো। বড় সাইজের একটা গলফ-ব্যাগকে দ্বিগুণ করলে তার ভেতরে একটা বোমার সব কিছু ঢুকিয়ে ফেলা যাবে। খুব ভারী, বুঝতেই পারছ। বড় একটা গাড়ির পেছনে তোলা যাবে। গাড়িটাকে শহরে চালিয়ে এনে পার্ক করো

কোথাও, তারপর টাইম সুইচ অন করে চলে যাও। দু'ঘণ্টা সময় দাও নিজেকে, অন্তত একশো মাইল দূরে পালাবার জন্যে। ব্যস!'

'হুম। এবার বোমার সঙ্গে যে মিসাইল আছে, ওগুলো সম্পর্কে শোনা যাক।'

'ওগুলোর রেঞ্জ খুব কম, বড়জোর আধ মাইল। তবে সাগরের তলা থেকে ছোঁড়া সম্ভব। টাইমার আছে, অ্যাকটিভেট করে ওখান থেকে সরে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে নিজে থেকেই রওনা হবে।'

রানার বলতে ইচ্ছে করল, একেই বলে: পরের জন্য কবর খুঁড়লে...

'বস্ আমাকে বললেন তোমার কাছে কিছু সূত্র আছে,' সোফার কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকল অনিল। 'তাঁর কথা শুনে আমার ধারণা হয়েছে, তুমি জানো ঠিক কোত্থেকে আমরা তদন্ত শুরু করব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তবে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আন্দামানে তোমাদের একটা মিসাইল ঘাঁটি আছে, তাই না?'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল অনিল। 'মাই গড, রানা! এটা তো একটা ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন!'

'তোমার বস্ মিস্টার বটব্যালের মুখে নিশ্চয় কাউন্ট দুয়ার্তের কথা শুনেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল অনিল।

'তার ব্রিফকেসে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের একটা ম্যাপ ছিল। ম্যাপটার এক জায়গায় একটা লাল ক্রসচিহ্ন দেখেছি, নীচে লেখা ছিল মিসাইল ঘাঁটি।' মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তোমাদের ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন পেয়েছি আমি ওই লোকটার কাছ থেকে। ব্রিফকেসটায় আন্দামান ফ্লাইটের একটা টিকিটও ছিল। তাই ভাবছি, চলো, পোর্ট ব্লেয়ার থেকেই তদন্ত শুরু করি আমরা।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আন্দামানে একজনের যাওয়া দরকার,' বলল অনিল।

রানা বুঝল না। 'একজনের যাওয়া দরকার মানে?'

হাসল অনিল। 'একজন মানে তোমার কথা বলছি, তুমি আন্দামানেই যাও। আমি সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করতে চাই। বস্ আমাকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন আর কী। আমিও মনে করি খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার আন্দামানের ফ্লাইট বাতিল করে দিয়ে কাউন্ট সিঙ্গাপুরে গেল কেন।'

'তাকে আমি সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের প্লেনে চড়তে দেখেছি, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখিনি ঠিক কোথায় যাচ্ছে সে।'

'আমরা খোঁজ নিয়েছি,' বলল অনিল। 'প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে বস্ নিশ্চিত হয়েছেন কাউন্ট দুয়ার্তে সিঙ্গাপুরেই নেমেছে।'

'ঠিক আছে, তা হলে দু'জনে দু'জায়গা থেকেই শুরু করি,' বলল রানা।

'তবে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখব আমরা,' বলল অনিল। 'প্লেনের টিকিট কাটা আছে, আজ রাতেই আমার ফ্লাইট। তেমন কোন ক্লু না পেলে আমি হয়তো কালই পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছে যাব। তুমি কখন রওনা হতে চাও?'

'কাল সকালে,' বলল রানা।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে পকেট থেকে একটা চেক বই বের করল অনিল। 'বস্ আমাকে বলে দিয়েছেন তোমার সমস্ত খরচ ভারত সরকার...'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'না, অনিল। প্রতিবেশীকে সাহায্য করলে টাকা নিতে হয় না। নিলে আমার বস্ মাইন্ড করবেন।'

শ্রাগ করে চেক বইটা আবার পকেটে রেখে দিল অনিল। 'আমরা তোমাদের প্রতি–'

ভুরু কুঁচকে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল অনিল। 'পোর্ট ব্লেয়ারের পুলিশ কমিশনার খগেন মিত্র, চিফ অভ ইমিগ্রেশন ভি. বিশ্বনাথন আর মিসাইল ঘাঁটির কমান্ডার জেনারেল জনার্দন ত্রিপুরারিকে এখনই টেলিফোন করে দিচ্ছি আমি। যখন যেমন প্রয়োজন হয় তোমার, সবরকম সাহায্য করার জন্যে তৈরি থাকবেন তাঁরা।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে টেলিফোনটা দেখিয়ে দিল রানা। 'আমার নাম বোলো সাপুড়ে।'

'ছদ্মনাম নিয়ে যেতে চাইছ।'

'ওই নামের পাসপোর্টই এখন ব্যবহার করতে হবে,' বলল রানা। 'বাবুরাম সাপুড়ে।'

হাসল অনিল। 'ঠিক। একজন সাপুড়েই দরকার ওদের।'

কাজ সেরে অনিল বিদায় নেয়ার আগে আবার বলল রানা, 'মাসীমাকে আমার সালাম জানিয়ো। আর বোলো, যখনই তাঁর হাতের অপূর্ব রান্নার কথা মনে পড়ে, ইচ্ছে হয়, ছুটে চলে যাই কোলকাতা।'

নিজ মায়ের প্রশংসা শুনে অনাবিল হাসি ফুটল অনিলের মুখে। যাবার আগে বুকে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

ছয়

দু'দিন আগের ঘটনা। স্থান: ভারতীয় রাতের আকাশ।

ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল স্পিডে এক ঘণ্টা বিশ মিনিট মিগ-২৯ চালাবার পর

মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল পাইলট কৃষ্ণকান্ত তিওয়ারি, তারপর কবজি একটু ঘুরিয়ে চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়িটা।

হ্যাঁ, এখনই সময়। মোট দূরত্বের অর্ধেকের বেশি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা, যে-যার সিটে সবাই শরীর শিথিল করে দিয়ে বসে আছে, চোখে ঘুম ঘুম ভাব।

ওদের গন্তব্য হায়দ্রাবাদ। বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই প্লেনে একা হতে চায় কৃষ্ণকান্ত। রেইডারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য দরকার সেটা। ওদের গন্তব্য আর তার গন্তব্য এক নয়। কোর্স বদলে আন্দামানের দিকে যাবে সে, কোন অবস্থাতেই রেইডারে এটা ধরা পড়া চলবে না। কেউ যখন একটা কাজের জন্য পাঁচ কোটি রুপি মজুরী দিতে চায়, শুধু তা-ই নয় অবলীলায় দশ লাখ অগ্রিম দিয়ে দেয়, নিশ্চয়ই কাজটায় কোনও রকম ক্রটি দেখতে চাইবে না সে।

আমি কৃষ্ণকান্ত তিওয়ারি, ভাবছে পাইলট, সত্যি বিরল ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি। ঈশ্বর আমাকে সব সময় সাহায্য করেন, যখন যা চাই তা-ই পেয়ে যাই। আমার ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হলো, বিশেষ করে অন্যায় আর অনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তিনি বেশি করে পূরণ করেন।

গরীবের ঘরে জন্ম, কাজেই ঘোড়ারোগ তো একটা থাকতেই হবে। স্কুলের গণ্ডি পেরুতেই ইচ্ছে হলো তাকে পাইলট হতে হবে। কথাটা কীভাবে যেন গ্রামের ডাকসেটে মাতবর লছমনজি পেয়ারেলালের কানে পৌছাল। সে তার দশ বছরের মেয়ে কালো আর কুৎসিত কস্তুরির সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল, বিনিময়ে শহরের আবাসিক কলেজে পড়াবার সব খরচ বহন করতে রাজি।

যথাসময়ে পাইলট হলো কৃষ্ণকান্ত, কিন্তু বিয়ের পর পনেরো বছর কেটে গেলেও কস্তুরির সঙ্গে সংসার করল না সে। ঈশ্বরকে সে বলল, আমার জীবন থেকে কস্তুরিকে তুমি সরিয়ে নাও। স্বামীর অবহেলা আর ঘৃণা উপলব্ধি করতে পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল কস্তুরি।

এরপর কৃষ্ণকান্ত তার ছোট বোনের বান্ধবী নৃত্য শিল্পী দোলন কাপাডিয়াকে বিয়ে করল। নাচকে দোলন জীবনের চেয়েও বড় করে দেখত। টের পেয়ে, সেটাকে পুঁজি হিস্যাবে ব্যবহার করতে চাইল কৃষ্ণকান্ত। 'ঈশ্বর, পাইলট হয়ে ক' টাকাই বা আয় করি, তুমি বউকে দিয়ে রোজগারের ভাল একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

ভগবান কৃষ্ণকান্তের মাধ্যমে দোলনকে প্রস্তাব দিল। 'হয় তুমি পুরোপুরি নাচ ছাড়বে, নয়তো যত খুশি নেচে প্রতি মাসে লাখখানেক রুপি এনে দেবে–দুটোর একটা বেছে নাও।'

রফা হলো পঞ্চাশ হাজার রুপিতে। তবে তিন মাস পরেই নিজের ভুল বুঝতে

পেরে দোলন কৃষ্ণকান্তের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

এরপর কৃষ্ণকান্ত ঈশ্বরকে ধরল: 'ভগবান, তুমি আমাকে বিরাট ধনসম্পদ পাইয়ে দাও! লোকে কোটি কোটি রুপির অফার নিয়ে আসুক আমার কাছে।'

ঈশ্বরও একখানা পেয়েছে বটে কৃষ্ণকান্ত, তার সব চাওয়াই যেন তাকে পূরণ করতে হবে। ধনঞ্জয় ভূপতি এল তার জীবনে। দু'মাসেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা। ভূপতিকে ভূপতি নয়, কৃষ্ণকান্তের মনে হতে লাগল তার প্রার্থনা পূরণ করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই চলে এসেছে বুঝি তার জীবনে।

ধনঞ্জয় ভূপতি তাকে বলল, 'বারবার ছুঁচো মারবে আর হাত গন্ধ করবে, এটা কি ঠিক? বড় দাঁও মারো, ইয়ার। তুম চাহো তো তুমকো ক্রোড়পতি বানা দুঁ।'

'চাইলেই তুমি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে দিতে পার? কীভাবে?' আনন্দে আটখানা কৃষ্ণকান্ত, টের পেয়েছে ঈশ্বর আবার তার আবদার পূরণ করতে চলেছে।

কীভাবে কী করতে হবে ব্যাখ্যা করল ধনঞ্জয় ভূপতি। কৃষ্ণকান্ত ভাবল—আরে, এ তো আমার জন্যে পানি। এই কাজের জন্যে নগদ পাঁচ কোটি রুপি, ভাবা যায়! ও রাজি হতে চলেছে দেখে ওর হাতে জোর করে দশ লাখ রুপি গুঁজে দিল ভূপতি অগ্রিম হিসাবে।

কো-পাইলটের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল কৃষ্ণকান্ত। ধীরে ধীরে, আড়ষ্টভঙ্গিতে সিট ছেড়ে দাঁড়াল সে। পকেট থেকে আগেই হাতে চলে এসেছে লাল রিঙ লাগানো ছোট একটা সিলিন্ডার। পরিষ্কার মনে আছে তার মাথাটা কতবার ঘোরালে গন্ধবিহীন গ্যাসটা বেরুবে।

সরে এল কৃষ্ণকান্ত। নিজের সিট ছেড়ে পাইলটের সিটে গিয়ে বসল কো-পাইলট।

পালা করে নেভিগেটর, রেডিও অপারেটর, ইঞ্জিনিয়ার, অতিথি ক্রুশ অবজারভার আর কো-পাইলটের দিকে তাকাল কৃষ্ণকান্ত। 'মিনিট পনের ঝিমিয়ে নিই আমি,' বলল সে, ককপিট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ওদের দিকে পিছন ফিরে মেটালম্যাপ র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল একবার। হাতে লুকানো সিলিন্ডারটা দু'হাতে ধরে গুণে গুণে তিনবার মোচড়াল সে, তারপর বইগুলোর পিছনে রেখে দিল।

'ককপিট থেকে কেবিনে বেরিয়ে এসে দরজার পাশ থেকে দ্রুত হাতে অক্সিজেন মাস্কটা নামিয়ে পরে নিল কৃষ্ণকান্ত। একটা চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে আর তর্ক করছে নিজের সঙ্গে—দরজা ফাঁক করে কী ঘটছে দেখবে একবার, নাকি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে? তাকে বলে দেওয়া হয়েছে পাঁচ মিনিটের বেশি

লাগবে না।

এক মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল। কৌতূহলে মরে যাচ্ছে কৃষ্ণকান্ত। চেয়ার ছেড়ে ককপিটের দরজা খুলল সে। প্রথমে সামান্য।

ঠিক দুই মিনিটের মাথায় ম্যাপ র‍্যাকের সবচেয়ে কাছে বসা নেভিগেটর অকস্মাৎ নিজের গলাটা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরল, মুখের ভিতর থেকে ঘড়-ঘড় করে ভীতিকর আওয়াজ বেরুচ্ছে। রেডিও অপারেটর দাঁড়িয়ে পড়েছে, এয়ারফোন ফেলে দিয়ে সামনের দিকে পা ফেলল। কিন্তু এগোতে পারল না, হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাওয়ায় নিচু হলো সে, তারপর কাত হয়ে ককপিটের মেঝেতে পড়ে গেল। বাকি তিনজনও বাতাসের অভাবে ছটফট করছে। কো-পাইলট আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার নিজেদের সিটে বসে মোচড় খাচ্ছে, শেষ দিকে সাহায্য পাওয়ার আশায় পরস্পরকে ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে হাত বাড়াল। ফলে যে যার সিট থেকে পড়ে গেল দু'জনেই। মেঝেতে ওদের আচরণ দেখে মনে হলো পরস্পরকে সাহায্য নয়, খামচাবার চেষ্টা করছে তারা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপরই হাত-পা ছড়িয়ে স্থির হয়ে গেল।

সবার শেষে সিট থেকে ঢলে পড়ল রুশ অবজারভার।

দরজার ফাঁক থেকে চোখ সরিয়ে এনে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল কৃষ্ণকান্ত। মাত্র চার মিনিট লেগেছে। আরও এক মিনিট পার হোক।

এক মিনিট পর হাতে দস্তানা পরে ককপিটে ঢুকল কৃষ্ণকান্ত, অক্সিজেন মাস্কের ফ্লেক্সিবল টিউব তার পিছনে লম্বা হচ্ছে। ম্যাপ র‍্যাকের সামনে থেমে সায়ানাইড গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারের ভালভটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে বন্ধ করল। এরপর ককপিটের প্রেশারাইজেশন অ্যাডজাস্ট করল সে, বিষাক্ত গ্যাস যাতে বেরিয়ে যায়।

লাশগুলো টপকে পাইলটের সিটে ফিরে এল কৃষ্ণকান্ত। ধনঞ্জয় ভূপতি সিলিন্ডারটা দেওয়ার সময় বলে দিয়েছে, ককপিটে ঢোকার পর পনের মিনিট অক্সিজেন মাস্ক পরে থাকতে হবে। সাবধানের মার নেই, কৃষ্ণকান্ত পঁচিশ মিনিট পার না হতে খুলল না ওটা। ইতিমধ্যে প্লেনের কোর্স সামান্য বদলে ফেলেছে সে, নেমে এসেছে বত্রিশ হাজার ফুটে। সামনে সাগর পড়বে, তখন রেইডারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য পানির যতটা সম্ভব কাছাকাছি নেমে যাবে কৃষ্ণকান্ত। লাশগুলো এক এক করে কেবিনে রেখে এসে আবার নিজের সিটে বসল সে, পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল।

'চেন্নাই থেকে আন্দামান তেরো-চোদ্দোশো কিলোমিটার। আন্দামান সংলগ্ন ডিফেন্স দ্বীপে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের একটা মিসাইল ঘাঁটি আছে, ওখানকার রেইডার সিস্টেম অত্যন্ত শক্তিশালী। কাজেই সাগরের উপর দিয়ে এগোবার সময়

পানির যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে হবে মিগ-উনত্রিশকে।

'কোকো আইল্যান্ড একশো মাইল দূরে থাকতেই মিটমিট করা লাল বিকন দেখতে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হতে হবে ফাইনাল অ্যাপ্রোচের জন্য। ওখানে, কোকো চ্যানেলে, পানির গভীরতা মাত্র চল্লিশ ফুট। স্পিড একেবারে কমিয়ে ফ্ল্যাপ নামাতে হবে। এস্কেপ হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। তোমাকে তুলে নেয়া হবে এক নম্বর ইয়টে।

'পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটা ফ্লাইট ধরে ব্যাঙ্ককে পৌঁছাবে তুমি। ওখান থেকে দুটো প্লেন বদলে পৌঁছে যাবে সুইটজারল্যান্ডে। একাধিক পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট, নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া হবে তোমাকে। সুইস ফাইভ স্টার হোটেল জিপ্পি-র রিজার্ভ করা স্যুইটে পৌঁছাবার পর আইএফসিএফ ব্যাঙ্কে কাগজ-পত্র পাবে তুমি। ওগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে ওই ব্যাঙ্কে তোমার নামে পাঁচ কোটি রুপির সমপরিমাণ মার্কিন ডলার জমা রাখা হয়েছে। চেক বইটাও পাবে ওখানেই।'

প্লেনের পজিশন, কোর্স আর স্পিড চেক করল কৃষ্ণকান্ত। আর বেশি দেরি নেই। আন্দামানে এখন রাত নটা।

লাল মিটমিটে বিকন পরিষ্কার দেখতে পেল কৃষ্ণকান্ত। গ্রেট কোকো আর লিটল কোকো, এই দুটো দ্বীপকে সযত্নে এড়িয়ে কোকো চ্যানেলের উপর পৌঁছাল তার চুরি করা মিগ। এই কাজে বোট ব্যবহার করছে ধনঞ্জয় ভূপতি, ছোট-বড় দুটো বোট দেখতে পেল সে। পানির উপর ল্যান্ড করার মধ্যে ঝুঁকি তো আছেই, তবে আন্দামান সাগর একদম শান্ত দেখে তার বশংবদ ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে ভুল করল না কৃষ্ণকান্ত। প্রায় অনায়াসে মিগ নিয়ে পানিতে নেমে পড়ল সে। ইঞ্জিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছে।

প্লেনের পেট জোর ধাক্কা খেল পানির সঙ্গে। দ্বিতীয় ধাক্কাটা লাগল নাকে। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল মিগ...তারপর আবার ঝপাৎ করে নামল পানিতে... একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি!

ক্র্যাম্পের শিকার আঙুলগুলোকে কন্ট্রোল থেকে টেনে নিল কৃষ্ণকান্ত, জানালা দিয়ে অবাক দৃষ্টিতে ফেনা আর ছোট ছোট ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ও ভঁগবান, আমি সত্যি পেরেছি!

এবার প্রশংসা! খাতির! আর পুরস্কার!

প্লেন ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছে, ডুবতে শুরু করা জেটগুলো থেকে হিসহিস শব্দে বাষ্প বেরুচ্ছে। কৃষ্ণকান্তের পিছনে ভাঙা আর ছেঁড়া মেটাল কর্কশ আওয়াজ করছে। পানিতে বাড়ি খাওয়ার সময় প্লেনের পিছন দিকটা ভেঙে গেছে, ফাটলটা

বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। ককপিট থেকে ফিউযিলাজে বেরিয়ে এল কৃষ্ণকান্ত। তার পায়ের চারপাশে কলকল করছে সাগরের পানি। ভিতরে ঢুকে পড়া চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটা লাশের মুখ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার প্রতুল মিশ্রকে চিনতে পারল কৃষ্ণকান্ত। তারা বাল্যবন্ধুই ছিল। নিজেকে সান্ত্বনা দিল সে–কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে, পোর্ট সাইডের ইমার্জেন্সি ডোর খুলে গেল।

কবাটটা বাইরের দিকে খুলল, বাইরে বেরিয়ে ডানার উপর দাঁড়াল কৃষ্ণকান্ত।

বড় বোটটা রাজহংসের ভঙ্গিতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে, ঝরঝরমার্কা ছোট বোটটা প্লেনের একেবারে কাছে চলে এসেছে। ছ'জন লোক রয়েছে ওটায়। তাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে উল্লসিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কৃষ্ণকান্ত। উত্তরে হাত তুলল এক লোক। লোকগুলোর মুখ চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত, কৌতূহলী, শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কৃষ্ণকান্ত ভাবল, ধনঞ্জয় ভূপতির লোক তো, তারই মত সিরিয়াস এরা, অত্যন্ত দক্ষ আর প্র্যাকটিক্যাল। এরকমই তো হওয়া উচিত। নিজের উল্লাসের লাগাম টেনে ধরে সে-ও একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল।

পাশে চলে এল বোট, ইতিমধ্যে ডানার নাগাল পেয়ে গেছে পানি। এক লোক লাফ দিয়ে ভেজা ডানায় উঠে কৃষ্ণকান্তের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা বেঁটে, শক্ত-সমর্থ; চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত ধারাল। খুব সাবধানে হাঁটছে সে, পা ফেলছে দৃঢ় ভঙ্গিতে, ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য হাঁটু একটু ভাঁজ করে রেখেছে। তার বাম হাতের বুড়ো আঙুল বেল্টে আটকানো।

কণ্ঠস্বরে ফুর্তি, চোখে মুখে আনন্দ; কৃষ্ণকান্ত বলল, 'গুড ইভনিং! গুড ইভনিং! আস্ত একখানা মিগ-২৯ ডেলিভারি দিচ্ছি, একেবারে টিপ-টপ কন্ডিশনে···হাহ্, হাহ্ হাহ্ হাহ্···' কৌতুকটা অনেক আগেই বানিয়ে রেখেছিল সে। 'প্লিজ, সই করুন এখানে।' নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বোটের লোকটা কৃষ্ণকান্তের বাড়ান হাত বেশ জোরেই ধরল। তারপর নিজেকে শক্ত করে টান দিল হ্যাঁচকা। আকস্মিক ঝাঁকিতে পিছন দিকে হেলে পড়ল কৃষ্ণকান্তের মাথা। এখন শুধু প্রকাণ্ড চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছে সে। ঠিক এই সময় ওর চিবুকের নীচে ঝিক্ করে উঠল ছুরির ফলাটা। ওখান দিয়ে ঢুকে জিভ ভেদ করে পৌঁছে গেল মগজে। পলকের বিস্ময়, ক্ষণস্থায়ী তীব্র ব্যথা, মাথার ভিতর উজ্জ্বল আলোর বিস্ফোরণ। তারপর সব অন্ধকার।

এক মুহূর্ত ছুরিটা ধরে থাকল খুনি, হাতের পিঠে কৃষ্ণকান্তের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বিঁধছে। তারপর ধীরে ধীরে ডানার উপর লাশটা নামিয়ে রাখল, টান দিয়ে খুলে নিল ছুরিটা। সাগরের পানিতে চুবিয়ে ফলার রক্ত ধুলো সে, কৃষ্ণকান্তের পিঠে ঘষে শুকিয়ে নিল সেটা; বেল্টের পিছনে আটকানো খাপে ভরল। এবার

লাশটা ডানার উপর দিয়ে টেনে এনে ইমার্জেন্সি ডোর দিয়ে ভিতরের পানিতে ফেলে লাগিয়ে দিল দরজা।

বোটে ফিরে এসে হাত তুলে সংকেত দিল খুনি। ইতিমধ্যে ড্রাইভার ছাড়া বোটের বাকি চারজন যে-যার অ্যাকুয়ালাঙ পরে নিয়েছে। মাউথপিস অ্যাডজাস্ট করে এক-এক করে বোট থেকে পানিতে ঝাঁপ দিল তারা, এক রাশ করে বুদ্বুদ রেখে তলিয়ে গেল নীচে।

শেষ লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ড্রাইভার বোটের কিনারা থেকে ধীরে ধীরে নামাতে শুরু করল বড় আকারের একটা আন্ডারওয়াটার সার্চলাইট। মোটা কেইবল্টা সাবধানে, একটু-একটু করে ছাড়ছে। হাতঘড়ির উপর একবার চোখ বুলিয়ে একটা সুইচ অন করল সে। সাগর আর ডুবন্ত মিগ-২৯ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

অলস ভাবে চলছে ইঞ্জিন, গিয়ার দিল ড্রাইভার, পিছু হটাচ্ছে বোটকে, সেই সঙ্গে কেইবল্ ছাড়ছে। বিশ গজ পিছু হটার পর, ডুবন্ত প্লেনের শোষণের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে, বোট থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। নামিয়ে দিল নোঙর।

ওভারঅলের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ড্রাইভার, একটা সাধল খুনিকে। সিগারেট নিয়ে সাবধানে সেটাকে দু'টুকরো করল খুনি, এক টুকরো গুঁজে রাখল কানের পিছনে, ধরাল অপরটা।

সাত

নিজের ইয়টে রয়েছে ধনঞ্জয় ভূপতি। চোখ থেকে নাইট গ্লাস নামাল সে, সাদা শার্ক-স্কিন জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে ভুরু আর কপালে বুলাল। দামী সেন্টের গন্ধ জীবনের আরাম আর সহজ দিকটা মনে করিয়ে দিল তাকে, ভাবল লাস্যময়ী সুন্দরী তৃষ্ণা এই মুহূর্তে ক্যাপটেন'স ক্লাবের রেস্তোরাঁয় ডিনারে বসতে যাচ্ছে। বলতে গেলে পোর্ট ব্লেয়ারের প্রায় সব কিছুই চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে।

রুমালটা পকেটে রেখে দিল ভূপতি। ঠিক, তৃষ্ণাকে মিস করছি আমি, ভাবল সে, তবে এ-ও কম উত্তেজক নয়। কী রোমাঞ্চকর একটা অপারেশন! ঘড়ির কাঁটা ধরেই তো সারা হচ্ছে সব। হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল। দশটা পনেরো।

মিগ-২৯ পৌছাতে অবশ্য ত্রিশ মিনিট দেরি করেছে, ফলে অপেক্ষার সময়টুকু

খুব খারাপভাবে কেটেছে তার। তবে ল্যান্ডিংটা ছিল নিখুঁত। পাইলট কৃষ্ণকান্ত-সমস্যার সমাধানও দ্রুত, দক্ষতার সঙ্গে করতে পেরেছে প্রভাকর; ফলে বরাদ্দ করা বিশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিটই বেঁচে গেছে। কাজেই শেডিউলের চেয়ে মাত্র পনেরো মিনিট পিছিয়ে তারা। বোমাগুলো বের করার জন্য রিকভারি গ্রুপকে অক্সি-অ্যাসেটিলিন কাটার ব্যবহার করতে না হলে বাকি পনেরো মিনিটও পূরণ করে নেওয়া যেত।

তবে এটাও আশা করা ঠিক নয় যে সবকিছু নিখুঁত হবে। সামনে কমবেশি সাত ঘণ্টা অন্ধকার পড়ে আছে, ওই সময়ের মধ্যে সারতে হবে আরও জটিল কয়েকটা কাজ।

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে রেডিও রুমে ঢুকল ধনঞ্জয় ভূপতি। ডিফেন্স আইল্যান্ডের মিসাইল ঘাঁটিতে অস্বাভাবিক কোন তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে? পোর্ট ব্লেয়ার কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে কিছু শুনছ? নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া প্লেনের কোন রিপোর্ট? কিংবা কোকো চ্যানেলের আশপাশে কোনও প্লেন ক্র্যাশ করার খবর? বেশ, ভাল। সজাগ থাকো।

রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে এসে বড়সড় স্টেটরুমের ভিতর দিয়ে এগোল ভূপতি, ধাপ বেয়ে নেমে এল হোল্ডে। এক পাশে চারটে অ্যাকুয়ালাঙ নিয়ে বি-টিমের চারজন লোক বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। চওড়া আন্ডারওয়াটার হ্যাচটা খোলা। বোটের নীচের বালিতে চাঁদের আলো পড়ায় ছ'ফুট উপরের হোল্ড থেকে ওগুলোকে চিকচিক করতে দেখা যাচ্ছে।

লোকগুলোর পাশে মোটা তারপুলিনের স্তূপ রয়েছে। ম্লান রঙ দিয়ে পেইন্ট করা তারপুলিন, কোথাও সবুজ, কোথাও খয়েরি।

'সব খুব ভালভাবে এগোচ্ছে। রিকভারি টিমের কাজ শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। আন্ডারওয়াটার চ্যারিয়ট আর স্লেজের খবর কী?'

এক লোক নীচের দিকে বুড়ো আঙুল তাক করল। 'ওগুলো নীচে, বালির ওপর। কাজ এগিয়ে রাখার জন্যে নামিয়ে দিয়েছি আগেই।'

'বেশ।' হোল্ডের উপর বাল্কহেডে ক্রেনের মত দেখতে একটা জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করল ভূপতি। 'ডেরিকটা ভার সহ্য করতে পারবে তো?'

'ওই চেইন দিয়ে আরও অনেক বেশি ওজনের জিনিস তোলা যাবে।'

'পাম্প?'

'রেডি। সাত মিনিটের মধ্যে হোল্ড পরিষ্কার করে ফেলবে ওগুলো।'

'গুড। ঠাণ্ডা মাথায়, বুঝলে? শান্ত থাকো সবাই। সারাটা রাতই কাজ চলবে।'

লোহার মই বেয়ে হোল্ড থেকে ডেকে উঠে এল ভূপতি। নাইট গ্লাস দরকার

হলো না, দুশো গজ দূরে পানির নীচ থেকে উঠে আসা সোনালি আভায় ভাসছে নোঙর ফেলা ঝক্কড়মার্কা বোটটা। লাল মার্কার লাইট বোটে তুলে ফেলা হয়েছে। ছোট জেনারেটরটা খুব জোরে না হলেও সারাক্ষণ ভট-ভট করছে, নীরব রাতে বেশ অনেকটা দূর থেকে শোনা যাবে। উপায়ও নেই, সার্চলাইটের জন্য বিদ্যুৎ তৈরি করছে ওটা। কাছের দ্বীপটা মাইল পাঁচেক দূরে, আশা করা যায় সেখান থেকে কেউ শুনতে পাবে না। হ্যাচ হয়ে ব্রিজে উঠে এল ভূপতি, তারপর এগিয়ে গিয়ে আলোকিত চার্ট টেবিলের উপর ঝুঁকল।

কয়েক মিনিট পর হ্যাচে নক করে ভিতরে ঢুকল একজন ক্রু। 'ওরা সংকেত দিয়েছে। সাবমেরিন আর স্লেজ রওনা হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে।' ডিভাইডারটা রেখে দিয়ে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল ভূপতি।

খুদে একটা আলোর কণিকা পানির তলা দিয়ে ঝক্কড়মার্কা পুরানো বোটটার দিকে এগোচ্ছে। দু'জন বসার উপযোগী আন্ডারওয়াটার চ্যারিয়ট ওটা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইটালিয়ানরা ব্যবহার করত; বানিয়েছে ইটালির বিখ্যাত একটা কোম্পানি, যারা ওয়ান সিটার সাবমেরিন আবিষ্কার করেছিল। টু-সিটার এই চ্যারিয়ট নেগেটিভ বয়্যান্সির একটা ওয়াটার স্লেজকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এ-ধরনের স্লেজ সাধারণত পানির তলায় ভারী কোন বস্তু স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার করা হয়।

আলোর ফোঁটাটা সার্চলাইটের আভার সঙ্গে মিশে গেল, কয়েক মিনিট পর আবার দেখা গেল, পুরানো বোটটার দিকে এগোচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ফিরতি পথ ধরেছে খুদে আলোটা, অর্থাৎ পিছনের স্লেজে একজোড়া নিউক্লিয়ার বোমা নিয়ে ইয়টে ফিরে আসছে টু-সিটার চ্যারিয়ট।

এরপর স্লেজে তোলা হবে বিশাল তারপুলিন। সাগরের তলায় যা-যা দেখা যায় তার সবই আঁকা আছে ওটার গায়ে—সাদা বালি, প্রবাল, নুড়ি পাথর, বোল্ডার ইত্যাদি। বিধ্বস্ত মিগ-উনত্রিশকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হবে ওই তারপুলিন দিয়ে। ঢাকার পর বড় আকারের খুঁটি দিয়ে প্রান্তগুলোকে সাগরতলের সঙ্গে শক্ত করে আটকানো হবে, যাতে স্রোতের ধাক্কায় ওটা স্থানচ্যুত না হয়।

কাজটা সেরে এক এক করে আটজন ক্রু পানির উপর মাথা তুলল। মেকানিক আর নাগা খুনি নরথেমা প্রভাকর ওদেরকে গিয়ার খুলতে সাহায্য করল। সুইচ টিপে নেভানো হলো আন্ডারওয়াটার আলো, টেনে তুলে আনা হলো বোটে। থেমে গেল জেনারেটরের ভট্-ভট্, তার বদলে শোনা গেল বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার যান্ত্রিক গুঞ্জন।

বোটটা এগিয়ে এল ইয়টের দিকে. ডেরিকের অপেক্ষারত বাহুতে ধরা

দেওয়ার জন্য। কাপলিংগুলো আটকাবার পর টেনে পরীক্ষা করা হলো। তারপর তীক্ষ্ণ ইলেকট্রিক গোঙানির সঙ্গে গোটা বোট, প্যাসেঞ্জার সহ, টেনে তুলে আনা হলো ইয়টের ডেকে।

ইয়টের ক্যাপটেন বেরিয়ে এসে ধনঞ্জয় ভূপতির সামনে দাঁড়াল। লোকটা তামিল, অত্যন্ত কর্কশ চেহারা। অসম্ভব রগচটা হিসেবে দুর্নাম আছে, ক্রুরা তাকে যমের মত ভয় করে। নির্দেশ অমান্য করায় স্টেটরুমে ডেকে পাঠিয়ে ওর মাথায় একটা চেয়ার ভেঙেছিল ভূপতি, সেই থেকে মালিকের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে সে, অর্থাৎ ঠিক এ-ধরনের ডিসিপ্লিনই শুধু বোঝে সে। এই মুহূর্তে স্যালুট ঠুকে সে জানাল, 'হোল্ড পরিষ্কার। রওনা হতে পারি, সার?'

'দুটো টিমই সন্তুষ্ট?'

'তাই তো বলছে তারা। কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি।'

'প্রথমে দেখো ওরা সবাই যাতে পুরো এক গ্লাস করে হুইস্কি পায়। তারপর সবাইকে বিশ্রাম নিতে বলে দাও। এক ঘণ্টা পর আবার ওদেরকে বেরুতে হবে। কুমারেশ লাহিড়ীকে বলো আমার সঙ্গে যেন একবার কথা বলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হবার জন্যে তৈরি হও।'

'ইয়েস, সার।'

চাঁদের আলোয় ফিযিসিস্ট কুমারেশের চোখ দুটো চকচক করছে। ভূপতি সামান্য কাঁপতে দেখল তাকে, যেন জ্বর হয়েছে। লোকটাকে শান্ত করতে চাইল সে। হেসে উঠে বলল, 'শোনো, বন্ধু। তুমি কি তোমার যন্ত্রপাতি নিয়ে সন্তুষ্ট? যা-যা দরকার সব তোমাকে আনিয়ে দেয়া হয়েছে তো?'

কুমারেশের ঠোঁট কাঁপছে। উত্তেজনায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। কথা বলার সময় নিজের অজান্তে গলা চড়িয়ে ফেলছে। 'এটা এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা। আপনার কোন ধারণা নেই কী করে বসেছেন। প্রাইভেট সিটিজেন হয়ে দু-দুটো নিউক্লিয়ার বোমার মালিক! আপনিই প্রথম! ইতিহাসের পাতায় আপনার নাম উঠবে। এধরনের মারণাস্ত্র নাগালের মধ্যে পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কী সিমপ্লিসিটি, কী সেফটি! এমনকী একটা শিশুও কোনও রকম বিপদের ঝুঁকি ছাড়াই এগুলো নাড়াচাড়া করতে পারবে।'

'ক্রেডল ওগুলোর জন্যে যথেষ্ট বড় তো? কাজ করার জন্যে জায়গা পাবেন আপনি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' উৎসাহের আতিশয্যে হাত ছুঁড়ছে কুমারেশ। 'কোথাও কোন সমস্যা নেই, একটাও না। ফিউজ অফ হতে কোন সময়ই লাগবে না। টাইম মেকানিজমের সঙ্গে ওগুলো বদলে নিলেই হবে, ব্যাপারটা এতই সহজ। প্রসাদ এরইমধ্যে থ্রেড অ্যাডজাস্ট করার কাজে নেমে পড়েছে। আমি লেড স্ক্রু ব্যবহার

করছি। মেশিনের জন্যে এগুলোই ভাল।'

'আর প্লাগ দুটো? যে ইগনাইটরগুলোর কথা আমাকে তুমি বলছিলে? নিরাপদ তো? ডাইভাররা কোথায় পেল ওগুলো?'

'পাইলটের সিটের নীচে, একটা সীসার তৈরি বাক্সের ভেতর। আমি যাচাই করে দেখেছি। খুব সহজ। লুকানোর জায়গায় ওগুলোকে অবশ্যই আলাদা করে রাখার কথা। রাবার ব্যাগগুলো চমৎকার। ঠিক যেমনটি দরকার ছিল। পরীক্ষা করে দেখেছি, সিল পুরোপুরি ওয়াটারটাইট।'

'রেডিয়েশনের কোনও বিপদ নেই?'

'এখন নেই। সবই তো সীসার তৈরি কেসে ভরা।' কাঁধ ঝাঁকাল কুমারেশ। 'দানবগুলোকে নিয়ে কাজ করার সময় আমি হয়তো একটু ভয় পাব, তবে হারনেস পরে থাকব। খেয়াল রাখব কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা। কী করতে হবে আমি জানি।'

'তুমি সত্যি খুব সাহসী লোক, লাহিড়ী। বাধ্য না হলে ওই শালার বোমের কাছে আমি অন্তত যাচ্ছি না। আমি আমার যৌন-জীবনকে অত্যধিক মূল্য দিই। তা হলে সমস্ত ব্যাপারেই সন্তুষ্ট তুমি, কেমন? কোথাও কোন সমস্যা নেই তোমার? প্লেনে কিছু রয়ে যায়নি?'

কুমারেশ বলল, 'না। কোথাও কোন সমস্যা নেই। সবই নিয়ে আসা হয়েছে। আমি যাই, কাজটা সেরে ফেলি।'

রোগাটে মূর্তিটাকে ডেক ধরে চলে যেতে দেখছে ধনঞ্জয় ভূপতি। বিজ্ঞানীরা অদ্ভুত জীব। বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না তারা। কুমারেশ লাহিড়ীর চোখে ধরা পড়ছে না, এখনও কত রকম ঝুঁকি রয়েছে। তার দৃষ্টিতে, কয়েকটা স্ক্রু ঘোরালেই কাজটা শেষ হয়ে যাবে। ভূপতি চিন্তা করছে—বাকিটা সময় অপ্রয়োজনীয় সুপারকার্গো হয়ে থাকবে লোকটা। অনেক সহজ হয় তাকে সরিয়ে দিলে।

তবে এখনই সেটা করা যাবে না। কী পরিস্থিতি দেখা দেয় কে জানে, অস্ত্রগুলো যদি ব্যবহার করার দরকার হয় তখন তাকে দরকার হবে।

ককপিট ব্রিজে উঠে এল ভূপতি। হুইল সামনে নিয়ে বসে রয়েছে ক্যাপটেন। তাকে নির্দেশ দিল সে, 'ঠিক আছে, চলো, রওনা দিই।'

বোতাম টিপে দুটো ইঞ্জিনই স্টার্ট দিল ক্যাপটেন।

মোটর ইয়ট জলপরী একটা হাইড্রোফয়েল ক্রাফট। প্রয়োজনে এটা চল্লিশ নট স্পিডে ছুটতে পারে, যেন পানি না ছুঁয়ে রাজহাঁসের মত উড়ে যায়। ডিজাইনটা কী রকম হবে জানিয়ে একটা গ্রিক কোম্পানিকে অর্ডার দিয়ে এটাকে বানিয়েছে ভূপতি, কাজেই নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য তো থাকবেই।

মাস ছয়েক হলো ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপকূল এলাকায় উদয় হওয়ার পর থেকে রীতিমত একটা আলোড়ন তুলেছে জলপরী। ধনঞ্জয় ভূপতি সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, সে একজন নব্য ধনী, অত্যন্ত সৌখিন, হেসে-খেলে ফূর্তি করে জীবনটা চুটিয়ে উপভোগ করছে। অত্যন্ত ভদ্রলোক হিসাবেই লোকে তাকে চিনল। অমায়িক, গরীবদের প্রতি সদয়। যেমন স্মার্ট তেমনি সুদর্শন, তেমনি বড়লোক; অথচ এতটুকু গর্ব নেই।

ধীরে ধীরে খবরটা ছড়িয়ে দিল ভূপতি, আন্দামান আর নিকোবরের চারপাশে সে আসলে গুপ্তধন খুঁজছে। ক্লাবের ডিনারে, ইয়টের ককটেল পার্টিতে পুলিশ কমিশনার, কাস্টমস চিফ, প্রশাসনের বড় কর্তাদের সঙ্গে নিজের ট্রেজার হান্ট সম্পর্কে গল্প করে। নেহাত ভাগ্যগুণে বোম্বেটেদের একটা গোপন মানচিত্র তার হাতে চলে এসেছে। বহু বছর আগে এদিকের পানিতে একটা জাহাজ ডুবেছিল। জাহাজটা চিন থেকে কয়েক শো টন সোনা নিয়ে ভারত মহাসাগর হয়ে কোথাও যাচ্ছিল। ঝড়ের কবলে পড়ে আন্দামানের দিকে চলে আসে সেটা, আর ঝড় থামার আগেই জলদস্যুদের হামলার মুখে পড়ে ডুবে যায়।

এত বছর পর জাহাজটার উপর প্রবালের পুরু স্তর তৈরি হয়েছে, তাই ওটাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রায় শূন্য। কিন্তু ধনঞ্জয় ভূপতির ভাগ্য, জাহাজটা কোথায় আছে তা সে বুঝতে পেরেছে। শীতের সময়টা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল সে, তখন ট্যুরিস্টদের ভিড়টা আরও কমবে; ওই সময় চারপাশের বিভিন্ন দেশ থেকে চলে আসবে তার শেয়ারহোল্ডাররা। সোনাভর্তি জাহাজ উদ্ধারের কাজও শুরু হবে পুরোদমে।

দু'দিন আগে ভূপতির উনিশজন শেয়ারহোল্ডার এসেও পড়েছে। কেউ তারা ভারতীয়, কেউ সিঙ্গাপুরী, আবার কেউ ইন্দোনেশিয়ান কিংবা থাই। সবারই কেমন যেন ভোঁতা চেহারা। স্বাস্থ্যবান, আর খুব গম্ভীর। লোকে ভাবল, অত্যন্ত পরিশ্রম করে বড় হওয়া রসকষহীন ব্যবসায়ীরা বোধহয় এরকমই হয় দেখতে।

পোর্ট ব্লেয়ারে ক্যাপটেন'স ক্লাবে মদ খেতে এল তারা। জুয়া খেলল। ট্যুরিস্টদের মত উঁচুদরের বেশ্যা মেয়েগুলোর সঙ্গে একটু বোধহয় মেলামেশাও করল। তারপর সেদিন সন্ধ্যায়, বন্দরের সমস্ত কৌতূহলী লোকজনের চোখের সামনে, সোনাভর্তি জাহাজ তুলতে রওনা হয়ে গেল সাদা রাজহাঁসের মত দেখতে জলপরী।

সবাই জানে নরকোন্দাম দ্বীপের দিকে অতীতে বহু জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছে। সেদিকেই যেতে দেখা গেল জলপরীকে। তবে খোলা সাগরে বেরিয়ে আসার পর ভূপতি যে দিক বদলে অন্য কোনও চ্যানেলের দিকে রওনা হয়েছে. সেটা কেউ জানতে পারেনি।

যাই হোক, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে রয়েছে এখন ভূপতি। বন্দরের লোকেরা আবার জলপরীর আওয়াজ শুনতে পাবে সেই ভোরের দিকে, ভেসে আসবে পুব দিক থেকে।

চার্ট টেবিলের সামনে এসে ঝুঁকল ভূপতি। জলপরী এখন ছুটছে লিট্‌ল্‌ কোকো দ্বীপের দিকে। আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ওটা। মায়ানমারের ওই দ্বীপটার পাঁচ মাইল উত্তরে আরও ছোট একটা দ্বীপ আছে, নাম টাইনি। টাইনিতে লোকজন নেই। ছ'মাস আগেই বেনামে ওটা লিজ নিয়েছে ভূপতি।

সে ভাবছে, প্রথম আর দ্বিতীয় পর্ব যেহেতু খুব ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে, এখন দ্বিগুণ যত্নের সঙ্গে শেষ করতে হবে তৃতীয় পর্বের কাজ। ক্যাপটেনকে কোর্স ঠিক রাখতে বলে নীচে নেমে রেডিও রুমে ঢুকল ভূপতি।

নামের সঙ্গে মিল আছে টাইনি আইল্যান্ডের। আকারে এক জোড়া টেনিস কোর্টের চেয়ে খুব বেশি বড় নয় ওটা। ঘাস আর বুনো ঝোপে ঢাকা প্রবালের একটা স্তূপ, খানাখন্দে বৃষ্টির পানি জমে আছে, কিনারায় সাদা বালি।

দ্রুত গতিতে ছুটে এল জলপরী, থামল দ্বীপ থেকে ছয়শো ফুট দূরে। নিঃশব্দে নেমে গিয়ে চল্লিশ ফুট গভীরে স্থির হলো নোঙর। হোল্ডের ভিতর ভূপতির সঙ্গে ডিসপোজাল টিমের চারজন লোক আন্ডারওয়াটার হ্যাচ খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পাঁচজনই তারা অ্যাকুয়ালাঙ পরে আছে। শক্তিশালী আন্ডারওয়াটার ইলেকট্রিক টর্চ ছাড়া ভূপতির সঙ্গে আর কিছু নেই। বাকি চারজন দু'জন করে জোড় বেঁধেছে–দুজন চ্যারিয়ট সামলাবে, আর দুজন স্লেজ। প্রত্যেকের পায়ে ফ্রগম্যান-ফ্লিপার। পায়ের কাছে স্লেজের উপর শক্ত জালের ভিতর শুয়ে আছে পুরু রাবার দিয়ে মোড়া দুটো ভয়ঙ্করদর্শন সিলিন্ডার।

প্রথমে ধীরে, তারপর হুড়মুড় করে পানি ঢুকল হোল্ডে। পাঁচজনই ডুবে গেল তারা। সামনে রয়েছে ভূপতি, সে-ই বেরোল প্রথমে, এবার বেরিয়ে গেল আন্ডারওয়াটার চ্যারিয়ট, তার পিছু নিয়ে সিলিন্ডার সহ স্লেজ। আগেই রিহার্সেল দেওয়া নির্দিষ্ট ব্যবধানে থেকে এগোল ওরা দ্বীপের দিকে।

প্রথমে টর্চ জ্বালল না ভূপতি। আলোর প্রয়োজন নেই, তা ছাড়া আলো দেখলেই বোকা মাছগুলো ছুটে আসবে। মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায় ঠিক মত কাজ করা যাবে না। এমনকী আলোর ডাকে হাঙর বা ব্যারাকুডাও চলে আসতে পারে।

চাঁদের নরম আলো পানির নীচে কুয়াশার মত একটা ভাব তৈরি করেছে। প্রথমে ঘোলা গভীরতা ছাড়া কিছুই তারা দেখতে পেল না, তবে একটু পর দ্বীপটার

প্রবাল প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হলো, খাড়াভাবে উঠে গেছে সারফেসের দিকে। সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর আগাছা দুলে উঠে গা-হাত নেড়ে কী-যেন বলতে চাইছে তাদেরকে। প্রবালের তৈরি বহুরঙা বিচিত্র ডিজাইনের গাছগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে তারা।

ছোট দ্বীপটার নীচের অংশ ঢেউ-এর আঘাতে আঘাতে ক্ষয়ে যাওয়ায়, নীচ থেকে তাকালে, মোটাসোটা একটা ব্যাঙের ছাতার মত লাগে দেখতে। ওই প্রবাল-ছাতার ঠিক নীচে চওড়া একটা ফাটল, যেন দ্বীপের গায়ে গাঢ় একটা ক্ষত। ওটার দিকে এগোল ভূপতি। টর্চ জ্বালল কাছাকাছি পৌঁছে।

প্রবাল ছাতার নীচটা অন্ধকার। টর্চের হলুদ আলোয় ছোট মাছ, রঙিন উদ্ভিদ, জেলি ফিস ইত্যাদির আলাদা একটা জগৎ উন্মোচিত হলো।

পায়ের ফিন নিচু করল ভূপতি, ভারসাম্য ঠিক করে একটা কারনিসে দাঁড়াল। চারদিকে তাকাচ্ছে সে, টর্চের আলো ফেলে সঙ্গীদের সাহায্য করছে। ইশারায় তাদেরকে দ্রুত এগিয়ে আসার নির্দেশ দিল সে।

আন্ডারওয়াটার গুহাটা মাত্র দশ গজ লম্বা। দুটো দলকে পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে এল ভূপতি। এখানে বুক-পানি। মূল চেম্বার থেকে সরু একটা ফাটল ছাদের দিকে উঠে গেছে, ফলে এখানে অক্সিজেনের কোন অভাব নেই। চেম্বারের বর্তমান ওয়াটার লাইনের বেশ কিছুটা উপরে লোহার গোঁজ গেঁথে আগেই একজোড়া ক্রেডল তৈরি করেছে ভূপতির লোকেরা, জালে জড়ানো নিউক্লিয়ার বোমাগুলো রাখার জন্য। ক্রেডলে ওগুলোকে আটকে রাখবে কয়েকটা করে লেদার স্ট্র্যাপ। এখান থেকে বেরিয়ে কোনও গাইগার কাউন্টারে ধরা পড়বে না রেডিয়েশন।

এক-এক করে ক্রেডলে তোলা হলো বোমাগুলো, বাঁধা হলো আচ্ছামত কষে।

কাজটা শেষ হতে লোকগুলোকে নিয়ে ইয়টে ফিরে এল ভূপতি। খুশি সে। তৃতীয় পর্বটাও নিখুঁতভাবে সারা গেছে।

ফিরতি পথ ধরল ইয়ট।

আট

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার।

জঙ্গলীঘাটের ওদিক থেকে তীরবেগে ছুটে এল মান্ধাতা আমলের কাছিম আকৃতির ক্রিম কালার ফোক্সওয়াগনটা, ড্রাইভিং সিটে একটি মেয়ে, বন্দরকে বাঁয়ে

রেখে সাদিপুরের দিকে যাচ্ছে। ডান দিকে তাকিয়ে ঘোড়ায় টানা একটা গাড়িকে দেখতে পেল সে, তার সামনের রাস্তায় বেরিয়ে আসছে সরু গলি থেকে।

সাবধান করে দিয়ে কোচোয়ান টুং-টুং করে ঘণ্টি বাজাল। কিন্তু মেয়েটি তাতে কান দিল না। কোচোয়ান লাগাম টেনে ধরলেও, গলির মুখ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ফোক্সওয়াগেনের একেবারে সামনে পড়ে গেল ঘোড়াটা।

ব্রেক কষার কর্কশ, গা রি-রি করা আওয়াজ হলো। ভাল চালায়, সময় মতই গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলল বেপরোয়া লাস্যময়ী সুন্দরী।

রেগে গেছে সে, গাড়ির দরজা খুলে নীচে নামল। খাটো স্কার্টের নীচে সুগঠিত একজোড়া পা হাঁটু পর্যন্ত উন্মুক্ত। গায়ে সবুজ টিশার্ট, আঁটসাঁট। নধর একটা শরীর, বেশ বোঝা যায় স্তন দুটো ভরাট আর নিরেট। তার রূপ-যৌবন আর সাজগোজ চাক্ষুষ করে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে প্রৌঢ় কোচোয়ান।

নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সে বলল, 'আপনার আরও সাবধানে গাড়ি চালান উচিত, দিদি। আপনার গাড়ির ওই ভোঁতা নাক আরেকটু হলে আমার পক্ষিরাজের গোঁফ কামিয়ে দিত!'

কোমরের দুই পাশে হাত রাখল মেয়েটি। কেউ তাকে কোনও কথা শোনাবে, এটা মেনে নেওয়ার পাত্রী সে নয়। চড়া গলায় বলল সে, 'ইস্, পক্ষিরাজ! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটা একটা কানা ঘোড়া। ওটার মত তুমিও বোধ হয় ঘাস খাও, না? তা না হলে মেইন রোডে বেরিয়ে এভাবে মানুষের পথ আটকাতে না।'

প্রৌঢ় দেহাতী প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলল, তারপর কী ভেবে সিদ্ধান্ত পাল্টে নরম করল গলার স্বর, 'ঠিক হ্যায়, মেমসাব, ঠিক হ্যায়।' ঘোড়ার লাগামে ঝাঁকি দিল, রাস্তা পার হয়ে আরেক গলিতে ঢুকল তার এক্কা। আপনমনে বিড়বিড় করছে কোচোয়ান, ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার তাকাল মেয়েটির দিকে। ভাবছে, নিশ্চয়ই কোন ধনীর বখাটে দুলালী, মহিলা মস্তান।

কিন্তু ওখানে তখন নেই সে। গাড়িটা রাস্তার মাঝখানে রেখে ফুটপাত পার হয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে পড়েছে।

বিশ গজ দূর থেকে গোটা দৃশ্যটা দেখেছে রানা। মেয়েটি সম্পর্কে কোচোয়ানের অনুভূতি আর ওর অনুভূতি প্রায় একই রকম। মেয়েটি কে তা-ও জানে ও।

দ্রুত পা চালিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

ভিতরটা ঠাণ্ডা। প্রায় খালিই বলা যায়, মেয়েটি ছাড়া আর কোনও খদ্দের নেই। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন সেলসম্যানের সঙ্গে তর্ক করছে সে।

'আপনাকে বলছি না, সিনিয়র সার্ভিস বা ফাইভ-ফিফটি-ফাইভ দরকার নেই

আমার? আমি জানতে চাইছি, 'এখানে এত রকম সিগারেট রয়েছে,' হাত তুলে দেখাল সে, 'এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাজে সিগারেট কোনটা? যেটায় টান দিলে দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসবে, সিগারেট আর খেতেই ইচ্ছে করবে না। নেই?'

পাগলাটে ট্যুরিস্টদের উদ্ভট আচরণে অভ্যস্ত সেলসম্যান লোকটা, বলল, 'দেখুন, ম্যাডাম...' ঘাড় ফিরিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে শেলফের দিকে তাকাল সে।

ভারি, গম্ভীর গলায় বলল রানা, 'ধূমপান কম করতে হলে দু'ধরনের সিগারেট থেকে যে-কোনও একটাকে বেছে নিতে হবে আপনার।'

ঝট্ করে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'কে আপনি? আপনাকে তো চিনলাম না।'

'আমার নাম বাবুরাম, বাবুরাম সাপুড়ে। ধূমপান ত্যাগ করার ব্যাপারে দুনিয়ার সবচেয়ে অভিজ্ঞ অথরিটি বলতে পারেন আমাকে। ধূমপান আমি কিছুদিন পরপরই ছেড়ে দিই। আপনার ভাগ্য ভাল যে, ঘটনাচক্রে এখানে আমি উপস্থিত রয়েছি।'

রানার আপাদমস্তকে বারকয়েক চোখ বুলাল মেয়েটি। এই লোককে পোর্ট ব্লেয়ারে আগে কখনও দেখেনি সে। বয়স বোঝা যায় না, ছাব্বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, দু'এক চুল কম-বেশি হতে পারে। কালো চোখের মায়া বলে দেয় নিরীহ ভালমানুষ। গাঢ় নীল লাইটওয়েট সুটে দারুণ মানিয়েছে, ক্রিম কালারের সিল্ক শার্টের সঙ্গে কালো টাই সুরুচির পরিচয় দেয়।

এটা তো পরিষ্কারই যে সুযোগ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। মুখটা ইন্টারেস্টিং, বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে। চেহারায় কর্তৃত্ব আছে। মেয়েটি সিদ্ধান্ত নিল, খেলবে। তবে সহজে ধরা দেবে না। ঠাণ্ডা সুরে বলল সে, 'ঠিক আছে। বলুন, শুনি।'

'সিগারেট ছাড়ার একটাই উপায়, ছাড়ার পর আর না ধরা। যদি ভান করেন এক হপ্তার জন্যে ছাড়বেন, সেটা হয়ে দাঁড়াবে নিজের ওপর নির্যাতন—কারণ সারাক্ষণ ভাববেন হপ্তাটা কখন পার হবে, সিগারেটের প্রতি আরও আকর্ষণ, আরও লোভ তৈরি হবে আপনার ভেতর। আমার মনে হয় হালকা সিগারেট ধরা উচিত আপনার, নিকোটিন ও টারের পরিমাণ যাতে খুব কম।'

'কিন্তু, না, মানে...'

'খেতেই চান না? তা হলে তো খুবই ভাল কথা।' হেসে উঠল রানা। 'ঠিক আছে, আপনার দেখাদেখি আমিও আবার ছেড়ে দিলাম। চলুন, বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে।' পথ দেখিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে দোকানটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'জানেন তো, সিগারেটের সঙ্গে ড্রিঙ্ক-এর একটা গভীর সম্পর্ক আছে? আপনি যদি অভ্যস্ত হন, তা হলে কি দুটোই ত্যাগ করবেন, নাকি একটা?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল মেয়েটি। 'দ্রুত, কৌশলে, একটু যেন বেশি ভেতরে ঢুকতে চাইছেন আপনি, মিস্টার···সাপুড়ে। ইয়ে, ঠিক আছে। তবে শহরের বাইরে কোথাও, কেমন? এদিকটায় বড্ড গরম। আপনি রংচং নামে জায়গাটা চেনেন? সাগরের ধারে বেশ কটা রিসর্ট আছে ওদিকে।' চট করে একবার রাস্তার দু'পাশে চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'আপনার ভাল লাগবে। চলুন, আপনাকে নিয়ে যাই। সাবধান, গাড়ির গায়ে হাত দেবেন না, আগুন হয়ে আছে।'

হাতে ফোস্কা পড়লেও এখন কিছু মনে করবে না রানা। এমনকী দামী সুটটায় আগুন ধরে গেলেও না। প্লেন থেকে নেমে আজই শহরে পা দিয়েছে, এরইমধ্যে হাতের নাগালে চলে এসেছে মেয়েটি। বাহ্!

আস্তিনাবাদকে বাঁয়ে রেখে ছুটছে ফোক্সওয়াগেন।

মেয়েটির হাতে কোন আঙটি নেই। হাতঘড়িটা ঢাউস। হাতব্যাগটাও বেশ বড়, সম্ভবত প্যারিসের কোন ফ্যাশন হাউসের তৈরি। ড্রাইভিং সিটে দারুণ মানিয়েছে তাকে, স্কার্টের কিনারা লালচে-ফরসা উরুর উপর উঠে আসায় আরও আকর্ষণীয় লাগছে। সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল রানা।

পূরণ করা ইমিগ্রেশন ফর্মে চোখ বুলিয়েছে আজ সকালে, ফলে মেয়েটি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানে রানা। তার নাম তৃষ্ণা কান্তা। জন্ম ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, বয়স ছাব্বিশ, পেশার ঘরে লিখেছে 'অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী'।

মাস ছয়েক হলো পোর্ট ব্লেয়ারে এসে জলপরীতে উঠেছে তৃষ্ণা, বোঝাই যায় ইয়ট মালিকের মিসট্রেস সে। মালিকের নাম ধনঞ্জয় ভূপতি, সে-ও একজন ভারতীয়, তবে তার বেশিরভাগ ব্যবসা ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, হংকং ও জাপানে।

সৈকতের কাছাকাছি এসে টালি দিয়ে ছাওয়া একটা কটেজের সামনে গাড়ি থামাল মেয়েটি। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: 'ট্যুরিস্ট'স হেভেন, রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বার'।

ভিতরে ঢুকে পিছন দিকের টেরেসে বেরিয়ে এল ওরা। একশো গজ দূরে আন্দামান সাগর। টেরেসের মাঝখানে একটাই টেবিল, তিনটে চেয়ার সহ। বসল ওরা। সাদা উর্দি পরা ওয়েটার অর্ডার নিতে এল।

'সময়টা এখন ঠিক দুপুর,' বলল রানা। 'সলিড কিছু নেবেন, নাকি সফট?'

মেয়েটি বলল, 'সফট।' ওয়েটারের দিকে মুখ তুলল। 'ভদকা, সঙ্গে সস্ সহ প্রচুর শ্রিম্প।'

'তা হলে আপনি হার্ড বলেন কাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা। নিজের জন্য হুইস্কির অর্ডার দিল ও।

'ভদকাকে হার্ড ড্রিঙ্কই বলতে হবে, তবে টমেটো সসের সঙ্গে খেলে ওটা সফট হয়ে যায়।' খালি চেয়ারটা নিজের দিকে খানিকটা টেনে নিল মেয়েটি, তারপর সেটার উপর পা দুটো তুলে দিল, ওগুলোয় যাতে রোদ লাগে। ভঙ্গিটা যথেষ্ট আরামদায়ক না লাগায় ঝাঁকিয়ে জুতো জোড়া খুলে ফেলল। 'কবে এলেন আপনি? আগে তো আপনাকে দেখিনি। তা ছাড়া, এটা তো ট্যুরিস্টদের ফিরে যাবার সময়।'

'এসেছি আজ সকালে। ব্যাঙ্কক থেকে। ট্যুরিস্ট নই, ব্যবসায়ী। বেশ কয়েকটা দেশে সাপ কেনা-বেচার দোকান আছে আমার। সাপের বিষও বেচি। এখানে এসেছি জায়গা দেখতে, সাপের খামার তৈরি করার ইচ্ছে। আপনি এখানে কতদিন হলো আছেন?'

'প্রায় ছ'মাস। আমি এসেছি জলপরী নামে একটা প্লেযার ইয়টে। আপনি হয়তো দেখেছেন ওটাকে। উপকূলে নোঙর ফেলেছে। আপনার প্লেন হয়তো সরাসরি ওটার ওপর দিয়েই উড়ে এসেছে।'

'সাদা রাজহাঁসের মত? আচ্ছা, ওটা তা হলে আপনার! সত্যি, ভারি সুন্দর, চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়।'

'ওটা আমার এক আত্মীয়র।' মেয়েটির চোখ রানার মুখটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে।

'আপনি ওই ইয়টেই থাকেন?'

'আরে, না। আমরা একটা বিচ প্রপার্টি ভাড়া নিয়েছি। জায়াগাটার নাম উইমবারলিগঞ্জ। ওদিকেই, কাছাকাছি নোঙর ফেলেছে জলপরী। দালানসহ বেশ বড় একটা জায়গা। মালিক একজন বার্মিজ। ঠিক জানি না, জায়গাটা বোধহয় বিক্রি করতে চায় সে। নির্জন, ট্যুরিস্টরা ওদিকে ঘেঁষে না।

'ঠিক এ-ধরনের একটা জায়গাই তো আমার দরকার।'

'আমাদের কোন সমস্যা নেই। হপ্তাখানেকের মধ্যে চলে যাচ্ছি আমরা।'

'ওহ্।' মেয়েটির চোখে চোখ রাখল রানা। 'দুঃখিত।'

'ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, আপনি আমাকে খুশি করতে চাইছেন।' হঠাৎ হেসে উঠল মেয়েটি। রানার মনে হলো, সে যেন অপরাধ বোধে ভুগছে। তবে হাসলে টোল পড়ে গালে। 'ভাল কথা, বিয়ে-থা করেছেন নাকি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি?'

'না।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে কোন সমস্যা নেই, কী বলেন?'

'তা নেই,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল মেয়েটি।

ফিরে এসে ড্রিঙ্ক সাজিয়ে দিয়ে গেল ওয়েটার।

'আপনি এত ভাল ইংরেজি বলেন, কোথায় পড়াশোনা করেছেন?'

'চেন্নাইয়ের একটা মিশনারি স্কুলে,' জবাব দিল মেয়েটি। 'আমার নাম তৃষ্ণা কান্তা। মিশনারি স্কুলে পড়তে পয়সা লাগত না। ওখান থেকে পাস করে ভর্তি হই নাচ আর অভিনয় শেখার কলেজে। আমার মা আমি ছোট থাকতেই মারা গিয়েছিলেন, বাবা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে বলিউডে যাই আমি। কিন্তু...' হাসল সে। 'ওসব ভুলে যাওয়াই ভাল। বলিউডে চান্স পাওয়া সহজ নয়। কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না।'

'তবে ইয়টের মালিক এই ভদ্রলোক তো আছেন, তাই না?' সাগরের দিকে তাকাল রানা। 'তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে দেখবেন।'

'না।' জবাবটা স্পষ্ট। রানা কোন মন্তব্য করছে না দেখে আবার বলল তৃষ্ণা, 'তিনি ঠিক আমার আত্মীয় নন। কাছাকাছির কেউও নন। বলতে পারেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একজন অভিভাবক।'

'ও, আচ্ছা।'

'আসুন না একদিন আমাদের ইয়টে,' বলল তৃষ্ণা, যেন জানানো দরকার যে অভিভাবক লোকটি তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। 'তার নাম ভূপতি, ধনঞ্জয় ভূপতি। আপনি হয়তো নামটা শুনেছেন। এদিকে কী যেন একটা ট্রেজার হান্ট করে বেড়াচ্ছে।'

'তাই?' হাসি হাসি মুখ করল রানা। 'বেশ মজার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যই পরিচয় হলে খুশি হব। কীসের ট্রেজার, জানেন কিছু? প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে?'

'ভগবান জানেন। কাউকে কিছু বলে না। ম্যাপ-ট্যাপ কী যেন একটা আছে। কিন্তু আমাকে দেখতে দেয় না। গুপ্তধন খুঁজতে যাবার সময় তীরে থাকতে হয় আমাকে। বেশ অনেক লোক এই উদ্ভট ব্যবসাতে পুঁজি খাটাচ্ছে; শেয়ারহোল্ডাররা আর কী। সবে মাত্র এসে পৌঁছেছে তারা। আর মাত্র সাতদিন আছি, কাজেই সত্যিকার হান্ট যে-কোনওদিন শুরু হয়ে যাবে।'

'কী ধরনের শেয়ারহোল্ডার তারা? জানি, ট্রেজার-হান্ট ব্যবসা হিসেবে একদম যাচ্ছেতাই—অসম্ভব ঝুঁকি থাকে। জুয়ার চেয়েও খারাপ। এক লাখের মধ্যে মাত্র এক ভাগ সম্ভাবনা কিছু পাওয়ার। এক ধরনের পাগলাটে লোক এই ব্যবসায় পুঁজি লাগায়। এরাও কি তাই?'

'পাগলাটে কি না জানি না। ধনী মানুষ, একটু হয়তো ভোঁতা কিসিমের। তবে সবাই খুব সিরিয়াস। সারাক্ষণ ভূপতির সঙ্গে আলোচনা করছে। নিশ্চয়ই প্ল্যান তৈরি করছে, তাই না? লোকগুলো রোদেও বেরোয় না, সাঁতারও কাটে না। আজ রাতে ওদের সম্মানে ক্যাপটেন'স ক্লাবে একটা পার্টি দিচ্ছে ভূপতি। আপনি

জানেন, ক্লাবটার নাম ক্যাপটেন'স কেন?'

মাথা নাড়ল রানা। ব্রিটিশ আমলের কথা। দুনিয়ার বহু দেশ থেকে জাহাজ এসে ভিড়ত পোর্ট ব্লেয়ারে। সাধারণ ক্রুদের জন্য সস্তাদরের মদের দোকান আর বেশ্যা পাড়া ছিল বন্দর এলাকায়। কিন্তু অফিসারদের সময় কাটানোর জন্য কিছু ছিল না। নরওয়ের এক ক্যাপটেন তার অচল হয়ে পড়া জাহাজ নিয়ে ছ'মাস আটকা পড়ে এখানে। অফিসারদের জন্য সে-ই এই ক্লাব গড়ে তোলে। আজ সেই ক্লাবের কত নাম-ডাক।

'বাহ্।' প্রসঙ্গ পাল্টে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আজ সারাদিন কী করছেন আপনি?'

'করার তো কিছুই নেই আমার, এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানো ছাড়া।' তারপর কে জানে কী মনে করে প্রায় আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল তৃষ্ণা। 'এবার আমাকে উঠতে হয়। ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ। ফেরার সময় ওদেরকে দিয়ে ট্যাক্সি আনিয়ে নেবেন।' চেয়ার থেকে পা নামিয়ে দাঁড়াল, জুতো জোড়া পরল।

'চলুন, গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।' তৃষ্ণার সঙ্গে রানাও বেরিয়ে এল বাইরে। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল তৃষ্ণা। রানা বলল, 'সময় করতে পারলে আজ রাতে হয়তো ক্লাবে দেখা করব আপনার সঙ্গে, কান্তা।'

'হয়তো।' গিয়ার এনগেজ করল তৃষ্ণা। আরেকবার তাকাল রানার দিকে। ভাবল, আবার একে দেখতে চাই আমি। 'তবে দোহাই লাগে, আপনি আমাকে কান্তা বলে ডাকবেন না। সবাই আমাকে তৃষ্ণা বলে ডাকে।' সামান্য একটু হাসল সে, তবে সেটা চোখেও ছড়াল। একটা হাত তুলে নাড়ল সে। তারপর হুস করে চলে গেল।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ওরে শালী!' বিড়বিড় করল ও। রেস্টুরেন্টে ফিরছে, বিল মিটিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলবে ওদেরকে।

ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল রানা। সিঙ্গাপুর থেকে আজ অনিলের আসার কথা। অত্যাধুনিক দুটো গাইগার কাউন্টার নিয়ে আসছে সে; একটা ডাঙায় কাজ করবে, আরেকটা পানিতে।

আজ সকাল সাতটায় পৌঁছে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন থ্রি স্টার হোটেল তাজমহলে উঠেছে রানা। অনিলকে ধন্যবাদ, অ্যারাইভাল লাউঞ্জে ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার খগেন মিত্র আর ইমিগ্রেশন চিফ ভি. বিশ্বনাথন। রানা ইচ্ছে প্রকাশ করায় মিসাইল ঘাঁটির প্রধান জেনারেল জনার্দন ত্রিপুরারির সঙ্গে একটা মিটিঙের ব্যবস্থাও করেন তাঁরা।

সংক্ষেপে পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনারেলকে একটা ধারণা দিয়ে মিসাইল ঘাঁটির রেডারে গত ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে রহস্যময় কিছু ধরা পড়েছে কিনা জানতে চাইল ও।

জেনারেল ত্রিপুরারি অকপটে স্বীকার করলেন, 'মিগটা যদি সাগরের সারফেস ঘেঁষে এদিক দিয়ে কোথাও যায়, আমাদের রেডারে সেটা ধরা না পড়ারই কথা, কারণ ওটার কাজই হলো উঁচু আকাশে নজর রাখা।'

রানার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল ইমিগ্রেশন চিফ ভি. বিশ্বনাথনকে। 'আমরা একজন বা দু'জন নয়, একদল লোককে খুঁজছি—এই ধরুন দশ থেকে বিশজন। কিংবা আরও বেশি। তারা সম্ভবত এক জায়গায় থাকতে চাইবে। এশিয়ান হবে, হতে পারে বেশির ভাগই ভারতীয়, দু'একজন ইউরোপিয়ান হওয়াও বিচিত্র নয়। কিংবা চিনা। তাদের নিজেদের প্লেন বা জাহাজ থাকতে পারে। হয়তো দু-এক দিন হলো আছে এখানে। কিংবা বেশ কিছু দিন থেকে।

'জানি, প্রচুর ট্যুরিস্ট আসছে আন্দামানে, কিন্তু তারা সবাই সাধারণত হোটেলেই উঠছে। হোটেলে উঠছে না, এমন গ্রুপগুলোকে খুঁজে বের করা সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকালেন ভি. বিশ্বনাথন। 'কয়েকটা গ্রুপের কথা এখনই আপনাকে বলতে পারি আমি, কিন্তু তাঁরা সবাই অত্যন্ত সম্মানী লোক।'

'মিস্টার বিশ্বনাথন, আমরা যাদেরকে খুঁজছি তারা সম্মানী মানুষই তো হবে। ভেবে দেখুন না, ছিঁচকে চোরেরা নিউক্লিয়ার বোমা চুরির কথা ভাবতে পারে? এর সঙ্গে অত্যন্ত উঁচু স্তরের লোকজন জড়িত। কি বলেন?'

চওড়া হাসি দেখা দিল ভি. বিশ্বনাথনের ঠোঁটে। 'তা হলে অত্যন্ত ধনী আর সম্মানী একটা গ্রুপের কথা বলি আপনাকে। তাঁরা এসেছেন ট্রেজার হান্টে।'

হেসে উঠলেন পুলিশ কমিশনার খগেন মিত্র। 'দূর মশাই, আপনি দেখছি হাসালেন! ওরা ফুর্তিবাজ প্লেবয়, কোটি কোটি টাকার মালিক, নিউক্লিয়ার বোমা নিয়ে কি ধুয়ে খাবে?'

জেনারেল ত্রিপুরারি বললেন, 'তবু, একটু খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার। মিস্টার রানা বলছেন তাদের জাহাজ থাকতে পারে, থাকতে পারে প্লেন। ওদের কিন্তু দুটোই আছে। ঠিক জাহাজ নয়, ইয়ট। প্লেনটাও অবশ্যি ছোট।'

রানা বলল, 'আমি আগ্রহ বোধ করছি।'

এরপর দীর্ঘ আলোচনা। ভি. বিশ্বনাথন অফিস থেকে কাগজ-পত্র আনিয়ে ধনঞ্জয় ভূপতি, তার লোকজন আর রক্ষিতা তৃষ্ণা কান্তা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানিয়ে দিলেন রানাকে।

ঠিক সময়েই পৌঁছাল অনিলের ফ্লাইট। এয়ারপোর্টের একটা রেস্তোরাঁয়

বসে লাঞ্চ সারল ওরা। সামান্য কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে স্বীকার করল অনিল, সিঙ্গাপুরের আন্ডারওয়ার্ল্ডে খোঁজ নিয়ে কোনও লাভ হয়নি। 'বাসযোগ্য পৃথিবী চাই' সম্পর্কে কেউ কোনও তথ্য দিতে রাজি নয়। আর কাউন্ট দুয়ার্তে সম্পর্কে তাকে বলা হয়েছে: আলফানসোর অতীত আছে, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই। রানাকে সে জিজ্ঞেস করল, এদিকের খবর কী।

পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে রানা জানাল, 'পরবর্তী কাজ জলপরী ভিজিট করা। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, তাঁর হেডকোয়ার্টারের চিলেকোঠায় একটা রেডিও সেট করা আছে, ইচ্ছে করলে ওখান থেকে দিল্লি, ঢাকা কিংবা বেইজিং-এর সঙ্গে কথা বলতে পারব আমরা।'

'চমৎকার।'

'আমি এরই মধ্যে চিনের ইন্টেলিজেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ, লিউ ফুচুঙের সঙ্গে আলাপ করেছি।'

'আচ্ছা! কী বলছে নাক বোঁচারা?'

'ভুল করলে, বন্ধু!' হেসে উঠে বলল রানা। 'দিন পাল্টেছে, হে। এখন আর বলা যাবে না যে চিনাদের নাক নেই, চিনা মেয়েদের বুক নেই। আমার বন্ধুর নাক ককেশানদের সঙ্গে অনায়াসে বদলে নিতে পারবে তুমি। আর আমার চিনা বান্ধবীদের কথা যদি বলি, অমন চমৎকার, অমন সুগঠিত, বুঝলে...'

অনিল তাড়াতাড়ি বলল, 'মাফ চাই, দোস্ত্! আমি আন্তরিক দুঃখিত!' হাসছে সে।

'যাই হোক, ফুচুং বলল, ওরা ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছে। 'প্ল্যান করছিল কীভাবে এগোবে, আমি জড়িয়ে পড়েছি শুনে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল: অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবে। আমরা তা হলে আর সরাসরি নাক গলাচ্ছি না। তোর যখন যা দরকার—লোকজন, যন্ত্রপাতি, টাকা-পয়সা—শুধু মুখ ফুটে চাইবি; চাহিবা মাত্র আমরা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিব।'

ম্লান একটু হেসে অনিল বলল, 'চিনাদের সঙ্গে তোমার খুব ভাল সম্পর্ক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা। হোটেলে ফিরে এসে বলল, 'ক্যাপটেন'স ক্লাবে আজ একটা পার্টি আছে। যাব আমরা, দেখব ওরা কেউ আমাদের পরিচিত কিনা। তবে প্রথম কাজ, ইয়টে কিছু আছে কিনা দেখতে হবে। তোমার গাইগার কাউন্টারটা আমাকে একবার দেখাবে?'

'অবশ্যই।' বাক্স খুলে চামড়া মোড়া একটা যন্ত্র বের করল অনিল, হুবহু একটা এসএলআর ক্যামেরার মত দেখতে। 'একটু সাহায্য করো,' বলে নিজের হাতঘড়িটা খুলে ফেলল সে, তার বদলে অন্য একটা হাতঘড়ি পরল। ক্যামেরাটা বাম কাঁধে ঝোলাল। 'হাতঘড়ির তারগুলো আস্তিনের ভিতর দিয়ে তুলে এনে

আমার কোটের ভেতরে ঢোকাও। হ্যাঁ। এবার ফ্ল্যাপটা উল্টে দেখো কোটের পকেটে ছোট দুটো গর্ত আছে। ওই গর্তের ভেতর দিয়ে তার দুটো এনে ঢুকিয়ে দাও বাক্সের গায়ের দুই গর্তে। গুড। আমরা এখন প্রস্তুত।' এক পা পিছিয়ে পোজ দিল অনিল। 'ক্যামেরা আর হাতঘড়ি সহ একজন সৌখিন ভদ্রলোক।' ক্যামেরার ফ্ল্যাপটা তুলল সে বোতাম খুলে। 'দেখেছ? নিখুঁত লেন্স সহ দামি একটা ক্যামেরা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। আসল জিনিসগুলো আছে পেছন দিকে—মেটাল ভালভ, সার্কিট আর ব্যাটারি। তুমি যদি এখন একটা নিউক্লিয়ার বোমার কাছে যাও, ঘড়ির কাঁটা ডায়াল থেকে গায়েব হয়ে যাবে। এবার চলো, দেখা যাক ওখানে আমাদের বোমা দুটো আছে কিনা।'

নয়

বন্দরের কাছাকাছি একটা প্রাইভেট জেটি থেকে স্পিড বোট ভাড়া করল রানা। উইমবারলিগঞ্জের ওদিকে যাওয়ার জন্য পুবদিকে ছোটাল সেটাকে বোটম্যান।

উপকূল রেখা ধরে পাঁচ কিলোমিটার এগোবার পরেই সাদা হাঁসের মত জলপরীকে দেখতে পেল ওরা।

'আরে বাপরে!' মুগ্ধকণ্ঠে বলল অনিল। 'ভারি সুন্দর তো!'

'গ্রিসে তৈরি। খোলের নীচে হাইড্রোফয়েল থাকায় পানি থেকে অনেকটা উঁচু হতে পারে।'

বোটম্যান বলল, 'বিয়াদোনার লোকজন বলাবলি করছিল আগামী কয়েকটা দিন গুপ্তধন তুলতে ব্যস্ত থাকবে ওটা। সোনার ভাগ নিতে প্রচুর লোক ছুটে এসেছে। গোপনে পুরো একটা রাত রেকি করেছে ইয়ট, নরকোন্দাম দ্বীপের ওদিকটায়।'

'তাই? তা কবে সেটা...মানে রেকি করল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই তো, দুই রাত আগে। সন্ধে ছ'টার দিকে রওনা হয়।'

খোলা পোর্টহোলগুলো মনে হলো ওদের আগমন লক্ষ করছে। ব্রিজে ওঠার পথে তামার রেইল পালিশ করছিল একজন সেইলর। কাজ থামিয়ে তাকে একটা মাউথপিসে কথা বলতে দেখল রানা।

সাদা সুট পরা দীর্ঘদেহী এক লোক ডেকে বেরিয়ে এসে চোখে বিনকিউলার তুলে ওদেরকে দেখছে। সেইলরকে কিছু বলল সে। স্টারবোর্ডের দিকে চলে এসে মইয়ের মাথায় দাঁড়াল সেইলর।

ওদের বোট ইয়টের পাশে চলে এল। সেইলর লোকটা হাত দুটোকে চোঙ বানিয়ে জানতে চাইল, 'এখানে আপনাদের কী কাজ, প্লিজ? আপনাদের কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?'

গলা চড়িয়ে রানা বলল, 'আমি বাবুরাম সাপুড়ে, থাইল্যান্ড থেকে আসছি। ইনি আমার অ্যাটর্নি। উইমবারলিগঞ্জে মিস্টার ভূপতির সম্পত্তি আছে, সেটা সম্পর্কে একটু খোঁজ-খবর নেব।'

'এক মিনিট, প্লিজ।' সেইলর অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই সাদা সুট পরা লোকটাকে নিয়ে ফিরে এল সে। পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা মিলে যাওয়ায় তাকে চিনতে পারল রানা।

সহাস্যে আহ্বান জানাল লোকটা, 'উঠে আসুন, উঠে আসুন।' সেইলরকে ইঙ্গিত করল, নীচে নেমে বোটটা বাঁধতে সাহায্য করতে হবে। বোট থেকে ইয়টে চলে এল অনিল ও রানা। মই বেয়ে উপরে উঠছে।

ডান হাতটা লম্বা করে দিল সাদা সুট। 'আমি ধনঞ্জয় ভূপতি। মিস্টার বাবুরাম সাপুড়ে? আর…?'

'আমার অ্যাটর্নি, মিস্টার প্রেমচাঁদ পটনায়েক।' হ্যান্ডশেক করল ওরা। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মিস্টার ভূপতি। ব্যাপারটা হলো, শুনলাম এক বার্মিজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বেশ বড় একটা জায়গা ভাড়া নিয়েছেন আপনি।'

'ও, হ্যাঁ।' ভূপতির হাসিতে মুক্তো ঝরল, হাবভাবে নিপাট ভদ্রলোক। 'আসুন, প্লিজ, স্টেটরুমে বসি।'

বড়সড় কেবিনটা নিশ্চয়ই নামকরা কোন ডিজাইনারকে দিয়ে সাজানো হয়েছে। দুই সেট ফ্রেঞ্চ সোফা, পাঁচটা আরামকেদারা, একজোড়া ডিভান; দেয়ালে মেহগনি কাঠের প্যানেল। যান্ত্রিক কোনও গুঞ্জন ছাড়াই এয়ারকুলার ঠাণ্ডা করে রেখেছে ভিতরটা।

'প্লিজ, বসুন। সিগারেট? তারপর বলুন, গলা ভেজাবার জন্যে কী দিতে পারি।' সুসজ্জিত বার-এর সামনে দাঁড়াল ভূপতি। 'ঠাণ্ডা কিছু, তবে খুব বেশি স্ট্রং নয়, ঠিক? জিন অ্যান্ড টনিক?'

জিন আর টনিকই নিল ওরা।

'আমি সাপের খামার করার জন্যে দালান সহ বেশ বড়সড় একটা জায়গা খুঁজছি,' খানিক পর আবার শুরু করল রানা।

'ও, তাই?' হাসল ভূপতি। 'ভাল সিদ্ধান্ত। দারুণ একটা জায়গা এটা। তা আপনার ঠিক কী সাহায্য দরকার বলুন তো?'

'শুনলাম জায়গাটা আপনি লিজ নিয়েছেন, তবে হয়তো শীঘ্রি ছেড়ে দেবেন। আপনি ছেড়ে দিলে ওটা কেনার জন্যে বার্মিজ লোকটার সঙ্গে আমি

আলাপ করতে পারি। তবে তার আগে জায়গাটা আমার একবার দেখা দরকার। সেজন্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।'

আবার মুক্তো ঝরিয়ে হাসল ভূপতি। হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিয়ে বলল, 'অভ কোর্স, অভ কোর্স। আপনার যখন খুশি। অত্যন্ত সুন্দর জায়গা ওটা। শুধু ধনী কেউ কেনার সামর্থ্য রাখে। ওখানে আমার ভাগ্নী ছাড়া আর কেউ থাকে না। তাকে একটা টেলিফোন করলেই হবে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ভূপতি।' সোফা ছাড়ল রানা, দেখাদেখি অনিলও। 'বিরক্ত করার জন্যে সত্যি দুঃখিত। শহরে আসুন না একদিন, একসঙ্গে লাঞ্চ করা যাবে। তবে,' চেহারায় মুগ্ধ ভাব ফুটিয়ে তুলল ও, 'এরকম একটা ইয়টের মালিক হওয়ায় ডাঙায় আপনি পা রাখেন কিনা সন্দেহ আছে আমার। এ-ধরনের ইয়ট ভারত মহাসাগরে কেন, আমার ধারণা সাত সমুদ্রের কোথাও দ্বিতীয়টি নেই।'

সন্তুষ্টচিত্তে হেসে উঠল ভূপতি। 'না...মানে, হ্যাঁ...তা বলতে পারেন।'

'তবে এ-ধরনের প্লেজার ইয়টে অ্যাকোমডেশনের সমস্যা থাকে, তাই না?'

নিজের প্রিয় জিনিসে কোন খুঁত নেই, এরকম একটা অহংকার থেকে ধনঞ্জয় ভূপতি তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, জলপরীর ব্যাপারে কথাটা একদম সত্যি নয়। পাঁচটা মিনিট সময় হবে আপনার? এই মুহূর্তে রীতিমত ভিড় লেগে আছে ইয়টে...'

হেসে ফেলল রানা। 'ভিড়? কই, আমি তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না।'

'আপনি আমাদের ট্রেজার হান্টের কথা শোনেননি?' হঠাৎ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'তবে না, এ বিষয়টা নিয়ে এখন কোন আলাপ করব না। জানা কথা, এ-ধরনের ব্যাপারে আপনি বিশ্বাসী নন। তবে এই মুহূর্তে আমার সহযোগীরা সবাই জলপরীতে উপস্থিত। ক্রুসহ সবাই মিলে আমরা চল্লিশ জন। দেখলেই বুঝবেন, তারপরও ইয়টটা ঘিঞ্জি হয়ে ওঠেনি। দেখতে চান? স্টেটরুমের পিছনের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল ভূপতি।

অনিল অনিচ্ছার ভান করছে। 'মনে আছে, মিস্টার সাপুড়ে, পাঁচটার সময় রাকেশ মহিন্দরের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

হাত ঝাপটা দিয়ে তার আপত্তি অগ্রাহ্য করল রানা। 'মিস্টার মহিন্দর অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমি জানি কয়েক মিনিট দেরি হলে তিনি কিছু মনে করবেন না। এরকম একটা ইয়ট ঘুরে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? যায় না। মিস্টার ভূপতি, প্লিজ, পথ দেখান।' অনিলকে গাইগার কাউন্টার চালু করার সুযোগ করে দিচ্ছে ও।

জাহাজ, যতই আধুনিক হোক, দেখতে কমবেশি একই রকম। ইঞ্জিন রুমের দু'দিকের করিডর ধরে পোর্ট আর স্টারবোর্ডে যাওয়া যায়, দু'পাশে দু'সারি কেবিনের বন্ধ দরজা। ভূপতি জানাল, ওগুলোয় লোকজন আছে। তবে কেবিনের বাইরেও বাথরুম আছে। গ্যালিতে দু'জন হিন্দীভাষী শেফ ভূপতির একটা কৌতুক শুনে হেসে উঠল।

ইঞ্জিন রুমটা প্রকাণ্ড, চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর তার মেট-এর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ওরা, নাক-চোখ দেখে থাই মনে হলো।

ছোট, টু-সিটার অ্যামফিবিয়ান প্লেনটাকে দেখা গেল আফটারডেকে, গাঢ় নীল আর সাদা পেইন্ট করা, ডানাগুলো এই মুহূর্তে ভাঁজ করা। আরেক পাশে পুরানো একটা বোট দেখা গেল, বিশজন লোক উঠতে পারবে, ডেরিকের সাহায্যে পানি থেকে তোলা হয়েছে আফটার ডেকে।

'আর হোল্ড? ওখানেও কেবিনের জন্যে জায়গা ছাড়তে হয়েছে?'

মাথা নাড়ল ভূপতি। 'শুধু স্টোরেজ। আর, হ্যাঁ, ফুয়েল ট্যাঙ্ক।' স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে বলতে ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে সে।

রেডিও রুমকে পাশ কাটাবার সময় রানা জানতে চাইল, 'শিপ-টু-শোর কমিউনিকেশনের জন্যে কী ব্যবহার করছেন? নিশ্চয়ই শর্ট আর লং ওয়েভ? একবার দেখতে পারি? রেডিওর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা...'

ভূপতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'অন্য কোনও দিন, প্লিজ, যদি কিছু মনে না করেন। আবহাওয়ার রিপোর্ট সংগ্রহ করার জন্যে অপারেটরকে ফুল টাইম খাটাচ্ছি। এই মুহূর্তে ওগুলো আমাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'অভ কোর্স।'

ব্রিজে উঠে এসে কন্ট্রোল কনসোলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করল ভূপতি। তারপর বলল, 'আশা করি মিস্টার প্রেমচাঁদ পটনায়েককে নিয়ে চলে আসবেন একদিন, সবাই মিলে সাগরে একটু বেড়াব। আজ, আপাতত...' হ্যান্ডশেক করার জন্য হাতটা বাড়িয়েছে সে, '...বুঝতেই পারছেন আজ আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত।'

'খুবই রোমাঞ্চকর, এই ট্রেজার হান্ট। কী মনে হচ্ছে, কিছু পাবেন?'

'ভাবতে ভাল লাগে, পাব,' ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফোটাল ভূপতি। 'কী পাব না পাব, এ নিয়ে অনেক কিছুই বলার আছে, কিন্তু আমার মুখ সেলাই করা। আশা করি আপনারা বুঝবেন।'

'অভ কোর্স। আপনাকে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার কথা বিবেচনা করতে হবে। আমি শুধু কল্পনা করতে পারি ওদের মধ্যে আমিও আছি, দলের সঙ্গে বেরুতে পারব। পুঁজি ঢালতে চায় এমন কাউকে আর বোধহয় নেয়া যায় না?'

'দুঃখিত, না। নিতে পারলে ভারি খুশি হতাম। মিস্টার পটনায়েক ঘন ঘন

হাতঘড়ি দেখছেন, কাজেই আপনাদেরকে আর দেরি করিয়ে দেব না।' আনুষ্ঠানিক বিদায় নিয়ে ডেক থেকে চলে গেল ভূপতি।

পিছন দিকে, বোটম্যানের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে বসল ওরা। মাথা নাড়ল অনিল। 'পুরোপুরি নেগেটিভ। রেডিও আর ইঞ্জিন রুমের চারপাশে সামান্য রিয়্যাকশন পেয়েছি, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক। লোকটাকে তোমার কেমন লাগল বলো দেখি।'

'সব কিছুই স্বাভাবিক। খুব বেশি ক্রু নয়, তবে যাদেরকে দেখেছি তারা হয় সাধারণ ক্রু, নয়তো অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা। তবে...'

'তবে?'

'দুটো ছোটখাট ব্যাপার আমার চোখে পড়েছে। হোল্ডে নামার জন্যে কিছু তো থাকবে? আমার চোখে পড়েনি। হয়তো ম্যানহোল আছে, প্যাসেজের কার্পেটে চাপা পড়া। কিন্তু তা হলে যে বলল রসদ রাখা হয়—কীভাবে রাখে, কীভাবে তোলে?'

'আর একটা কী?'

'আমাকে খোঁজ নিতে হবে জলপরীর ট্যাঙ্কে কতটুকু ফুয়েল ধরে,' বলল রানা। 'কারণ হোল্ডের ভেতর জায়গাটা বিরাট বলে মনে হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার। শেয়ারহোল্ডারদের একজনকেও আমরা দেখিনি।'

'দুপুরবেলা, ঘুমাচ্ছে?'

'হতে পারে। তাই বলে উনিশজনই? ভাবছি সারাক্ষণ কেবিনে বসে কী করছে তারা। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছ?'

'কী?'

'ভূপতি সিগারেট খেলো না, আর গোটা জাহাজে কোথাও তামাকের গন্ধ নেই? এটা অদ্ভুত। চল্লিশজন লোক, তার মধ্যে একজনও স্মোকার নেই। ব্যাপারটা কো-ইন্সিডেন্স, না ডিসিপ্লিন? সত্যিকারের প্রফেশনালরা মদ বা সিগারেট খায় না।'

মাথা চুলকাচ্ছে অনিল। 'তুমি এত কিছু লক্ষ করলে, অথচ আমি...'

'তুমি কীভাবে লক্ষ করবে, সারাক্ষণই তো তুমি গাইগার কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে ছিলে। ডেকো নেভিগেটর আর ইকো সাউন্ডারও দেখলাম, বুঝেছ। দুটোই খুব দামী। ব্রিজটা ঘুরিয়ে দেখাবার সময় ওগুলোর কথা কিন্তু তুলল না ভূপতি।'

'হুম। ইয়টের অর্ধেকের মত জায়গা দেখা হয়নি আমাদের এখনও। হোল্ডে হয়তো ট্রেজার হান্টে লাগে এমন কিছু ইকুইপমেন্ট লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'জলপরী নোঙর করে আছে চল্লিশ ফুট গভীর পানিতে,' বলল রানা। 'ধরো,

বোমা দুটো ওটার নীচে বালিতে যদি রাখা থাকত, তোমার গাইগার কাউন্টারে কি তা ধরা পড়ত?'

'সন্দেহ আছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তোমার আন্ডারওয়াটার মডেলটা নিয়ে সন্ধ্যার পর বেরুনো উচিত। ভাল কথা, ধনঞ্জয় ভূপতি আর তার শেয়ারহোল্ডারদের সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আশা করছি আজ বিকেলের দিকে একটা রিপোর্ট পাব।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না? শেয়ারহোল্ডাররা যেদিন এল, সেই রাতেই সাগরে বেরিয়ে ভোর পর্যন্ত ফিরল না জলপরী। যদি ধরে নিই মিগ-ঊনত্রিশের সঙ্গে অগভীর পানিতে কোথাও রঁদেভো ছিল ওটার? যদি বলি বোমা দুটো সংগ্রহ করে সরিয়ে রেখেছে···ইয়টের নীচে, বালিতে? কিংবা অন্য কোনও নিরাপদ জায়গায়? কী বলবে তুমি, অনিল?'

'বলব আজ সন্ধ্যার রিপোর্টটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

'বেশ। তবে তার আগেই ফুয়েল সম্পর্কে খোঁজ নেব আমি। তৃষ্ণার সঙ্গেও যোগাযোগ করব, ভূপতির ডাঙার আস্তানায় বোমা দুটো আছে কিনা দেখা দরকার। তারপর ক্লাবে গিয়ে ভূপতির শেয়ারহোল্ডারদের ওপর চোখ বুলাব। আর সবশেষে···'

'সবশেষে?'

'অ্যাকুয়ালাঙ পরে সাগরে নামব, তোমার দ্বিতীয় গাইগার কাউন্টার নিয়ে একটা চক্কর দিয়ে আসব জলপরীর চারদিকে।'

'আমাকেও আবার সঙ্গে নিতে চেয়ো না, প্লিজ,' বলল অনিল। পানির নীচটাকে খুব ভয় পায় সে, বাধ্য না হলে নামতে চায় না।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের চিলেকোঠায় পৌঁছে তিনটে রিপোর্ট পেল রানা—বিসিআই, চিন, ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিস আর ইন্টারপোল হেডকোয়ার্টার থেকে জানান হয়েছে, ধনঞ্জয় ভূপতি আর তার উনিশজন শেয়ারহোল্ডারের কারও বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই।

ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস থেকে অনিলের নামে আরও একটা মেসেজ এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর একটা সাবমেরিন 'মাভৈ' চেন্নাই থেকে রওনা হয়েছে, উদ্দেশ্য আন্দামান সাগরে টহল দেওয়া; ওরা যদি প্রয়োজন মনে করে, মাভৈ-এর কাছে যে-কোনও সার্ভিস চাইতে পারে। ওটার কমান্ডার গুজরাল সিন্ধিয়াকে এ-ব্যাপারে অ্যালার্ট করা হয়েছে।

টেলিফোনে রানার প্রস্তাব শুনে তৃষ্ণা জানাল, উইমবারলিগঞ্জের বাড়িটা আজ

সন্ধ্যায় ওদের দেখতে যাওয়াটা ঠিক হবে না, কারণ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তার অভিভাবক তীরে আসছে। ওকেও থাকতে হবে তাদের সঙ্গে। জলপরী নোঙর তুলে সরে আসছে বন্দরের দিকে, ক্যাপটেন'স ক্লাবের কাছাকাছি। ও, হ্যাঁ, ক্লাবের পার্টিতে এলে রানা কি ওর বাটনহোলে একটা লাল গোলাপ রাখবে? তার স্মৃতি খুব দুর্বল, মানুষের চেহারা মনে রাখতে পারে না।

হেসে ফেলে রানা জানাল—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

জলপরী বন্দরে আসছে শুনে খুশিই হলো ও। হারবারে ওটাকে পরীক্ষা করা অনেক সহজ, বেশি দূর সাঁতরাতেও হবে না। সিদ্ধান্ত নিল পুলিশের জেটি থেকে রওনা হবে ও, প্রয়োজন হলে একজন হাবিলদারের সাহায্য নেবে।

দশ

ক্যাপটেন'স ক্লাবের দোতলায় চলছে মেইনল্যান্ডের মণিপুর থেকে আসা নৃত্যশিল্পীদের একটা অনুষ্ঠান। আর তিনতলার একদিকে জমে উঠেছে তিন তাসের আড্ডা, আরেক দিকে টেবিল টেনিসের তীব্র প্রতিযোগিতা।

টেবিল টেনিসে অনিলকে পর-পর তিনটে গেম দিয়ে খেলায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলল ধনঞ্জয় ভূপতি।

'নাহ্, খেলে মজা পাচ্ছি না। আমার বোধহয় আরও উত্তেজক কিছু দরকার,' বলল সে।

'মজা পাচ্ছেন না, তার কারণ অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই আমার,' কপালের ঘাম মুছে বলল অনিল। 'আমার মক্কেল মিস্টার সাপুড়ে অবশ্য খুবই ভাল খেলেন। তাঁর সামনে আপনি দাঁড়াতে পারবেন না।'

হেসে ফেলল ভূপতি। 'তাই? তা কোথায় তিনি?'

নিজের অজান্তে চট করে ডানদিকের দরজাটার দিকে একবার তাকাল অনিল। 'আশপাশেই কোথাও আছেন, এসে পড়বেন এখনই।'

ভূপতি ভাবল, চোরা চোখে ওদিকে তাকাবার মানে কী? ওদিকে তো টং-এর নতুন কজন মেম্বার জুয়া খেলতে বসেছে।

'চলুন, আমরাই দেখি কী করছেন তিনি,' বলে সেদিকে এগোল ভূপতি।

কার্ড রুমে ঢুকে অনিল দেখল অচেনা তিনজন লোকের সঙ্গে বসে ফ্ল্যাশ খেলছে রানা। ওর পাশের খালি চেয়ারে বসল সে। রানার মুখোমুখি আরেকটা খালি চেয়ারে বসল ভূপতি।

'আমার শেয়ারহোল্ডার বন্ধুদের সঙ্গে দেখছি ভালই জমিয়ে ফেলেছেন, মিস্টার সাপুড়ে,' বলল সে। 'কিন্তু আপনার সামনে চিপস্ এত কম কেন? আপনি হারছেন নাকি? আরে, খেলা দেখছি থেমে আছে! কী ব্যাপার?'

ম্লান একটু হেসে রানা বলল, 'জুয়ায় তো হারজিত থাকবেই। খেলা থেমে আছে, কারণ "শো" বলার জন্যে যথেষ্ট চিপস নেই আমার।' অনিলের দিকে ঝুঁকল ও। 'মিস্টার পটনায়েক,' গলার আওয়াজ নিচু করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে কিছু টাকা হবে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে অনিল বলল, খুব একটা আস্তে নয়, 'কত, মিস্টার সাপুড়ে?'

'এই বিশ-পঁচিশ হাজার রুপি?'

আবারও এক সেকেন্ড ইতস্তত করে অনিল বলল, 'হবে।'

'প্লিজ, কাউন্টার থেকে বিশ হাজার রুপির চিপস নিয়ে আসুন।'

পাঁচ মিনিট পর টেবিলের মাঝখানে পাঁচশো রুপির চিপস রেখে রানা বলল, 'শো।'

ওর প্রতিপক্ষ, সিঙ্গাপুরিয়ান চিনা, নাম চিনিচাও সেয়ান, নিজের তাস তিনটে সিধে করল। রানিং ফ্ল্যাশ—হরতনের ৮, ৯ আর ১০।

রানারও তাই, অর্থাৎ রানিং ফ্ল্যাশ, তবে রুইতনের ৭, ৮, আর ৯।

'আবারও হারলেন,' বলল ভূপতি। 'দেখা যাচ্ছে খুব সহজ শিকার আপনি। ঠিক আছে, দেখি তো আপনার কাছ থেকে আমিও কিছু জিততে পারি কিনা।' নিজের এক লোককে দিয়ে এক লাখ রুপির চিপস আনাল সে।

এরপর পাঁচজনের তাস বাঁটা হলো। দেখা গেল খেলাটা রানা আর ভূপতির মধ্যে জমিয়ে তোলার জন্য তিন শেয়ারহোল্ডারই নিজেদের তাস একটু আগেভাগে দেখে 'অফ' হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারই ওরা দু'জন বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্লাইন্ড খেলে। একবার রানা নিজের তাস তুলছে না দেখে ভূপতিকে ভুরু কোঁচকাতে দেখা গেল। টেবিলের ম্যাঝখানে ত্রিশ হাজার রুপির কাছাকাছি চিপস্ জমেছে। প্রথম বার কার্ড না দেখেই ভূপতি বলল, কী নিয়ে এত ব্লাইন্ড খেলছেন দেখি তো—শো!' একশো রুপির একটা চিপস ছুঁড়ে দিল সে।

রানার কাছে দুই-এর জোড়া। দু'জনের খেলায় ব্লাইন্ডে শুধু একটা টেক্কা পেলেও জেতার ভাল সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে দুই-এর জোড়া রীতিমত ভাল তাস।

নিজের কার্ড ওল্টাল ভূপতি। তার কাছে কিছুই নেই—সবচেয়ে বড় কার্ড একটা আট।

পরের বার জিতল ভূপতি। তবে বেশি নয়।

এরপর কার্ড বাঁটা হলে শেয়ারহোল্ডারদের একজন নিজের কার্ড দেখার পরও খেলছে, অর্থাৎ ভাল কার্ড পেয়েছে সে। তার পাশে থাকায় ব্লাইন্ড খেলার সুযোগ পেল রানা। বেশ কিছুক্ষণ ব্লাইন্ড খেলার পর ভূপতিকে নিজের তাস দেখতে হলো। সে-ও খেলা ছাড়বে না, দ্বিগুণ চিপস ছুঁড়ল টেবিলে।

ব্লাইন্ড খেলার সুযোগটা এবার পুরোপুরি নিচ্ছে রানা। যেন পণ করেছে, কিছুতেই তুলবে না তাস টেবিল থেকে। ও একশো রুপি দিলে বাকি দু'জনকে দিতে হয় দুশো করে চারশো। তারপর শুরু হলো আসল মজা। মুচকি একটু হেসে দুশো রুপির একটা চিপস রাখল ও টেবিলের মাঝখানে, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের স্টেক এখন দ্বিগুণ।

নীরবে খেলা চলছে। এক সময় শেয়ারহোল্ডার লোকটা নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য নিজের তাসগুলো তুলে আরেকবার দেখে নিল। কিছুক্ষণ পর ভূপতির পিছনের একটা চেয়ারে এসে বসল তৃষ্ণা। টেবিলের মাঝখানে চিপসের স্তূপ আর টেবিলের চারপাশের টান টান উত্তেজনা তাকেও রোমাঞ্চিত করে তুলল। ভূপতির কানে কানে কিছু বলল সে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নিজের তাসগুলো আরেকবার দেখে নিল সে-ও।

আরও বারকয়েক খেলার পর ভূপতি আর শেয়ারহোল্ডার পরস্পরের তাস দেখার সিদ্ধান্ত নিল; যার কাছে বড় তাস আছে সে চালিয়ে যাবে খেলাটা, অপরজন 'বসে' যাবে।

শেয়ারহোল্ডার বসে গেল। এখন শুধু রানা আর ভূপতি। ভূপতি নিজের কার্ড দেখেছে, রানা দেখেনি। ভূপতিকে দিতে হচ্ছে চারশো রুপি, রানাকে কেবল দুইশো রুপি।

আরও পাঁচ হাজার রুপি খেলল রানা। তারপর স্টেক বাড়িয়ে দিল—চারশো রুপিতে। এখন ভূপতিকে দিতে হবে আটশো রুপি। অবশ্য রানার তাস দেখতে চেয়ে খেলাটা বন্ধ করতে পারে সে।

'আপনার মধ্যে দেখছি একটা সুইসাইডাল টেনডেন্সি আছে, মিস্টার বাবুরাম সাপুড়ে,' হাসতে হাসতে বলল ভূপতি। 'না জেনে, না বুঝে অন্ধকারে ঝাঁপ দেন নির্ভয়ে।'

'জাত সাপ নিয়ে কারবার করি,' বলল রানা, 'জানেনই তো। ঝুঁকি নেয়াটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।' স্টেক আরও বাড়িয়ে দিল ও—পাঁচশো।

ভূপতিকে এক হাজার রুপি দিতে হলো। আরও তিনবার দিল সে, তারপর বলল, 'আপনি নিজের তাস দেখছেন না কেন, মিস্টার সাপুড়ে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা। হাসছে ও। এই খেলায় এটা কোনও প্রশ্ন হতে পারে না, কাজেই জবাব দিচ্ছে না। ভূপতির সামনে পথ খোলা আছে,

যে-কোন সময় রানাকে তাস দেখাতে বাধ্য করতে পারে সে। কিংবা রানার চিপস্ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলাটা চালিয়ে যেতে পারে।

জেদাজেদি শুরু হয়েছে, কাজেই ভূপতি তাই করল; নীরবে দ্বিগুণ রুপি দিয়ে খেলে গেল সে, যতক্ষণ রানার চিপস শেষ না হলো।

'এবার?' হাসছে ভূপতি, হাজার রুপির একটা চিপস ফেলল টেবিলে। 'এবার কী করবেন? তাস দেখে যে শো দেবেন, সে রুপিও তো নেই আপনার।'

রানার কাছে মাত্র পাঁচশো রুপির চিপস্ আছে। তাস দেখে শো দিলে এক হাজার রুপি লাগবে। তবে নিজের তাস না দেখেও ভূপতির কাছে কী আছে দেখতে চাইতে পারে ও, তাতে পাঁচশো রুপিতেই হয়ে যাবে। কিন্তু এতক্ষণ ব্লাইন্ড খেলার পর নিজের তাস না দেখে 'শো' বলাটা একটু কেমন যেন।

রানাকে অবশ্য বাধ্য হয়ে তাই করতে হলো। চিপস্গুলো ঠেলে দিল ও, বলল, 'শো।'

তাসগুলো এক-এক করে ওল্টাল ভূপতি। এক রঙা তাস তার, সবগুলো চিড়িয়া–৫, ৮, ১০। ফ্ল্যাশ, তবে রানিং নয়। প্রতিপক্ষ ব্লাইন্ড, কাজেই বিরাট তাস এটা, জেতার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি।

রানাও একটা একটা করে নিজের তাস ওল্টাচ্ছে। প্রথমে রুইতনের একটা পাঁচ। তারপর চিড়িয়ার একটা সাত। অর্থাৎ ফ্ল্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, দুটো দুই রঙের তাস।

তৃতীয় তাসটা ওল্টাবার সময় ইচ্ছে করেই বেশি সময় নিচ্ছে রানা। অবশেষে দেখা গেল কী সেটা। একটা হরতন। সামান্য একটা ৬।

কিন্তু এই ৬-ই ৫ আর ৭-এর মাঝখানে অসামান্য, অর্থাৎ 'রান' হয়ে গেল।

প্রায় লাখখানেক রুপির চিপস্ নিজের দিকে টেনে নেওয়ার সময় হাসল রানা। 'নো রিস্ক, নো গেইন।'

'এক সেকেন্ড,' ভারি গলায় বলল ভূপতি। 'তাসটা যেন কে বেঁটেছিল, মিস্টার সাপুড়ে?'

হাসিটা চওড়া হলো রানার মুখে।

'আপনি,' মনে করিয়ে দিল ও। সব চিপস এক করে তুলে দিচ্ছে অনিলের হাতে। 'প্লিজ, মিস্টার পটনায়েক, এগুলো ক্যাশ করে বারে চলে যান, আমি আসছি।'

'এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়বেন?' রাগ সামলে জিজ্ঞেস করল ভূপতি। 'আরও জিততে চান না?' টেবিলের নীচে হাত দুটো তার শক্ত মুঠো হয়ে আছে। চোখের ইশারায় নিজের চিপস দেখাল। 'এগুলো না হেরে উঠি কীভাবে, বলুন!'

'অন্ধকারে এক-আধবারই ঝাঁপ দিতে হয়, মিস্টার ভূপতি,' বলল রানা,

চেয়ার ছাড়ছে। 'একজন ট্রেজার হান্টার হিসেবে এই নিয়ম আপনারও মেনে চলা উচিত, তা না হলে কখন কীসের সঙ্গে ধাক্কা খাবেন, আর উঠে দাঁড়াতেই পারবেন না।'

নীরবে সব সহ্য করে যাচ্ছে ভূপতি। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে-ও, হাতটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

তার পেশিসমৃদ্ধ লোমশ হাতটা ধরল রানা, হাড় ভাঙার জন্য চাপ দিতে পারে ভেবে তালুর ভিতর বুড়ো আঙুলটা ঢুকিয়ে রেখেছে। তবে ভূপতি শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে চাপ দিল; তার বেশি কিছু না।

'আজ রাতে প্রচুর কাজ আমার, অথচ দেখুন না ভাগ্নীটাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে সময় বের করতে হয়েছে।' ঘাড় ফিরিয়ে তৃষ্ণার দিকে তাকাল ভূপতি। 'তৃষ্ণা, ডিয়ার, তুমি বোধহয় মিস্টার সাপুড়েকে চেনো না, শুধু টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। সময়টা তোমার যদি একঘেয়ে লাগে, ওঁকে ধরে ঝুলে পড়তে পার।'

তৃষ্ণার দিকে ফিরে রানা বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু। আজ সকালে না ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে দেখা হলো আপনার সঙ্গে?'

চোখ কুঁচকে তাকাল মেয়েটি। নির্লিপ্ত একটা ভঙ্গি করে বলল, 'তাই? হতেও পারে। মানুষের চেহারা আমার মনে থাকে না।'

'কিছুক্ষণ আড্ডা দিলে মনে রাখা সহজ হবে,' হেসে বলল রানা। 'আপত্তি না থাকলে আপনি আমার সঙ্গে সাপার রুমে বসতে পারেন।'

চেয়ার ছাড়াল তৃষ্ণা। কণ্ঠে ঝাঁঝ ঝরিয়ে ভূপতিকে বলল সে, 'দেখো ধনঞ্জয় মামা, তোমার বোকামির জন্যে আমার ঘাড়ে কঠিন সব দায়িত্ব এসে চাপে। তোমার হারা রুপি কিছুটা হলেও ফ্যামিলিতে ফিরিয়ে আনার জন্যে এখন এই ভদ্রলোকের পিছু নিতে হচ্ছে আমাকে।'

হেসে উঠল ভূপতি। তার শান্ত, অমায়িক ভাব ফিরে এসেছে। 'বুঝতে পারছেন তো, মিস্টার বাবুরাম, জিতলেও আপনাকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হবে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে, গরম তাওয়া থেকে জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়ছেন আপনি। পরে আবার দেখা হবে, ডিয়ার ফেলো।'

সাপার রুম মানে রেস্তোরাঁ, ভিতরে ঢুকে কোনার একটা টেবিল বাছাই করল তৃষ্ণা। পিছনে থাকায় তার হাঁটার মধ্যে অতি সামান্য খোঁড়ানোর ভাব লক্ষ করল রানা।

ওয়েটারকে ডেকে শ্রিম্প কাটলেট আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল ও। ওয়েটার ফিরে যেতে প্রসঙ্গটা তুলল। 'আজ কি আপনি সাঁতরাতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন?'

চেহারা গম্ভীর করে রানার দিকে তাকাল তৃষ্ণা। 'না। আমার একটা পা আরেকটার চেয়ে এক ইঞ্চি ছোট। আপনার চোখে খুব খারাপ লাগল?'

'না। এর মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে। জিনিসটা আপনার মধ্যে বাচ্চা-মেয়ের ভাব এনে দিয়েছে।'

'বুনো এক আধবুড়ি রক্ষিতার বদলে? হ্যাঁ?' তৃষ্ণার চোখ দুটো চ্যালেঞ্জ করছে ওকে।

'নিজেকে আপনি এভাবে দেখেন?'

'ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়? যাই হোক, পোর্ট ব্লেয়ারে সবাই তাই জানে।' সরাসরি তাকাল সে। 'কথাটা কেউ আমাকে বলে না। বললেও আমি গ্রাহ্য করতাম না। আমার জীবনটাকে আমাকেই চালাতে হয়, শুধু আমিই জানি সেটাকে কীভাবে চালালে ভাল থাকব।'

'কেউ ভাল থাকলে কারও কিছু বলার থাকতে পারে না,' বলল রানা। 'আপনি শুনতে চান, আপনার সম্পর্কে আমি কী ভাবি?'

হাসল তৃষ্ণা। 'বানিয়ে বললে আমি কিন্তু কানে আঙুল দেব।'

'আমার ধারণা অত্যন্ত সরল মেয়ে আপনি। এই সরলতার কারণ, আপনি এখনও খুব ছোট। যতটা ভান করেন, তারচেয়েও ছোট। আমার ধারণা, খুব বাজে অবস্থা থেকে সংগ্রাম করে বেশ কিছুদূর এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু তারপর হঠাৎ কিছু একটা ঘটে যাওয়ায় মইটা হারিয়ে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, আমার প্রেমিক আমাকে একা ফেলে সাগরে চলে গেছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তৃষ্ণা। 'জানি কোনদিন ফিরবে না সে। কখনও তাকে আমার পাওয়া হবে না। তবু তাকেই আমি ভালবাসি এখনও। সেই আমার হিরো।'

'কোথায় গেছে সে? নাম কী তার?'

'আমার কাছে তার ছবি আছে, দেখবেন?' হেসে উঠে জানতে চাইল তৃষ্ণা। হাতব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সে, ধরাল একটা, তারপর প্যাকেটটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'তার নাম প্লেয়ার, একজন নাবিক।'

প্লেয়ার্স-এর প্যাকেটটা তুলে নিয়ে নাবিকের ছবিটা দেখল রানা। 'বলেছি না, তুমি এখনও খুব ছোট আর খানিকটা বোকাও।'

'কিন্তু আমার ভাই, আমার একমাত্র ভাই কিন্তু তা বলেন না। তাঁর চেয়ে আমি অনেক ছোট, প্রায় পনের বছরের। তিনি আমাকে আপনি বলেন, ম্যাডাম বলেন। একটু হয়তো স্বার্থপর, এয়ার ফোর্সের পাইলট হওয়ার পর খোঁজ-খবর রাখেন না, তারপরও তাঁকে আমি ভালবাসি। তিনি কী বলেন শুনবেন? বলেন আমার নাকি এত বুদ্ধি যে একদিন তিওয়ারি বংশের মুখ উজ্জ্বল করব...'

'আপনার পারিবারিক পদবী তিওয়ারি বুঝি?' প্লেয়ার্সের প্যাকেটটা খুলে একটা সিগারেট বের করল রানা।

'হ্যাঁ, তিওয়ারি।'

'তা আপনার ভাই এখন কোথায়? তাঁর নাম কী?'

'আমার ভাই কৃষ্ণকান্ত তিওয়ারি। শেষ খবর জানি এয়ার ফোর্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব পেয়েছেন। এবার হয়তো একটু শান্ত হবেন। রোজ রাতে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করি আমি। ওই এক ভাই ছাড়া আর তো কেউ নেই আমার। খবর না-ই নিন, তারপরও তাঁকে ভালবাসি আমি। ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন?'

সিগারেটটা এতক্ষণে ধরাল রানা। ইঙ্গিতে ওয়েটারকে বিল দিতে বলল। তারপর তৃষ্ণার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

এগারো

আকাশে আধ-খাওয়া চাঁদ। পুলিশের হাবিলদার শেখর শেঠ রানার পিঠে সিঙ্গেল অ্যাকুয়ালাঙ সিলিন্ডারটা বেঁধে দিল। বেল্টের সঙ্গে আগেই অনিলের দ্বিতীয় গাইগার কাউন্টার বেঁধে নিয়েছে রানা, শেষ আরেকবার টেনে-টুনে দেখে নিল সেটা। তারপর দু'সারি দাঁতের মাঝখানে রাবার মাউথপিস ফিট করল, ভালভ রিলিজ অ্যাডজাস্ট করল। কাছাকাছি একটা নাইট ক্লাব থেকে বাজনার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে।

'রাতের এই সময়টা সাগরে কী আশা করতে পারি আমি, শেঠজি? বড় কোনও মাছ?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল শেঠ, এতক্ষণ যেন এই প্রশ্নটা শোনার অপেক্ষাতেই ছিল সে। 'সাধারণত যা দেখা যায়, সার। ব্যারাকুডা? জরুর। হাঙর? আলবত। তবে ড্রেন থেকে পাওয়া আবর্জনায় ওগুলোর পেট ভরা থাকে। রক্ত না ঝরলে আপনাকে ওরা ঝামেলায় ফেলবে না।'

'ধন্যবাদ, শেঠজি। ঠিক আছে, আধ ঘণ্টা পর আবার দেখা হচ্ছে।' হাত দিয়ে ছুঁয়ে বেল্টে গোঁজা ছুরিটা দেখে নিল রানা, তারপর জেটির কিনারা থেকে ঝুপ করে লাফ দিল ঢেউ খেলানো পানিতে।

ঢেউয়ের নীচে চাঁদের আলো ম্লান দেখাচ্ছে। অগভীর মেঝেতে পড়ে রয়েছে মোটর গাড়ির টায়ার, বিয়ারের ক্যান, মদের ভাঙা বোতল ইত্যাদি। রানার

কালো ছায়া দেখে এক ঝাঁক ছোট মাছ বাঁক ঘুরে আরেক দিকে চলে গেল।

চাঁদটাকে ডান কাঁধে রেখে এগোচ্ছে রানা, কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে সামনে কোথায় কতটা দূরে নোঙর ফেলেছে জলপরী।

তারপর তৃষ্ণার কথা ভাবল রানা। সম্ভবত প্লেনটা যে হাইজ্যাক করেছে সেই লোকটার বোন সে! এমনও হতে পারে যে এই তথ্যটা হয়তো ভূপতিও জানে না, বোমা চুরির ষড়যন্ত্রে সে যদি জড়িত থাকেও। ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াল? কো-ইন্সিডেন্স। কাকতালীয়। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে? তৃষ্ণার আচরণে কিন্তু সরলতা ছিল।

আর ভূপতি? সে কি সত্যি দায়ী? তার আচরণ সন্দেহজনক, কথাবার্তা রহস্যময়। তবে তার বিরুদ্ধে এখনও কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। কাজেই বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় কিংবা ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের হেড অফিস নয়া দিল্লিতে এখনই কোনও রিপোর্ট পাঠানো উচিত হবে না।

হঠাৎ আশ্চর্য একটা অনুভূতি হলো রানার। বিপদ! বিপদ! বিপদ! শরীর শক্ত হয়ে উঠল। হাত চলে গেল ছুরির বাঁটে। ঝট্ করে ডানদিকে তাকাল–বাঁয়ে বা পিছন দিকে নয়। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে ডানদিকে তাকাতে বলেছে।

মস্ত একটা ব্যারাকুডা! বিশ পাউন্ডের বেশি ওজন হলে এদের মারাত্মক বিপদ বলে গণ্য করতে হবে। ওটার অস্ত্র হলো নিষ্ঠুর একজোড়া চোয়াল, র‍্যাটল স্নেকের মত নব্বুই ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে খুলতে পারে। নীল আর রুপালি রং মেশানো শরীর দেখতে অনেকটা ইস্পাতের মত, ওটার লেজের দিকের অলস ফিনও একটা অস্ত্র। রানার সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে এগোচ্ছে ওটা, দশ গজ দূরে, ধূসর অস্পষ্টতার ঠিক কিনারায়–দেখা যায় কি যায় না। বাঘের মত সোনালি জমিনে কালো চোখের মণি, সতর্ক, চাঁদের আলো লাগায় তীক্ষ্ণ দাঁত চকচক্ করছে। এই দাঁত মাছকে শুধু কামড় দেয় না, শরীরের একেকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গিলে ফেলে, তারপর আবার আঘাত হানে।

ভয়ে মোচড় খেতে শুরু করেছে রানার পেট। সাবধানে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল ও। জলপরীর কাছে পৌঁছাতে আরও তিন মিনিট বাকি। হঠাৎ করে ঘুরল ও, হামলা করার ভঙ্গিতে এগোল ব্যারাকুডার দিকে, হাতের ছুরি ঝিক করে উঠল চাঁদের আলোয়।

প্রকাণ্ড ব্যারাকুডা অলস ভঙ্গিতে লেজের দুই ঝাপটায় ধূসর পাঁচিলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু ঘুরে নিজের কোর্সে রানা ফিরতেই আবার সেটাকে দেখা গেল–মাপছে ওকে, যেন বাছাই করছে প্রথম আক্রমণটা কোথায় করবে, নিতম্বে নাকি কাঁধে।

বড় আকৃতির শিকারী মাছ সম্পর্কে কী জানে স্মরণ করতে চেষ্টা করল

রানা। ওগুলোর সঙ্গে অনেকবারই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে ওর অতীতে। প্রথম কথা, ভয় পাওয়া চলবে না। কুকুর আর ঘোড়ার মত, মানুষ ভয় পেলে মাছও টের পায়। যতটা সম্ভব শান্ত, স্বাভাবিক, নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন বেছে নিয়ে ধরে রাখতে হবে সেটাকে। তুমি ঘাবড়ে গেছ, এটা বুঝতে দিলেই সমস্যা। এলোমেলো ভাবে কিছু করা যাবে না। সাগরের তলায় বিশৃংখলার মানে, সম্ভাব্য শিকার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই একটা ছন্দ ধরে রাখতে হবে ওকে।

তাই রাখল রানা।

এরপর চাঁদের আলোয় দৃশ্যটা বদলে গেল। নরম ঘাস দেখা গেল সামনের জমিনে। ঢেউ থাকায় এমন ভঙ্গিতে দুলছে ওগুলো, রানার ভয় হলো সতর্ক না হলে সম্মোহিত হয়ে পড়বে ও।

রুপালি মাছের বিরাট একটা ঝাঁক দেখা গেল, ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। সমান্তরাল রেখার উপর দুটো মূর্তিকে দেখে মাছের মেঘ দু'ভাগ হয়ে গেল, যথেষ্ট ব্যবধান রেখে পাশ কাটাল ওদেরকে।

ঢেউ খেলানো ঘাসের মাঝখানে নোঙরের চেইনটা দেখতে পেল রানা, নীচ থেকে উঠে এসে হারিয়ে গেছে উপরের ধূসরতার ভিতর। টার্গেটে পৌঁছাতে পারার স্বস্তিতে ব্যারাকুডার কথা ভুলে গিয়ে চেইনটাকে অনুসরণ করল রানা, কী দেখতে পাবে ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কিছুদূর ওঠার পর নীচের দিকে তাকিয়ে ব্যারাকুডাটাকে কোথাও দেখতে পেল না রানা। নোঙরের চেইন হয়তো বৈরী বলে মনে হয়েছে ওটার কাছে।

মাথার দিকে বোটের দীর্ঘ খোলটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। হাইড্রোফয়েলের ভাঁজ করা মেকানিজম কিম্ভূত দেখাচ্ছে, যেন এখানকার জিনিসই নয়। ওটার স্টারবোর্ডের কিনারায় থেমে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। ওর বাম দিকে, অনেকটা নীচে, প্রকাণ্ড একজোড়া ঝুলন্ত প্রপেলার দেখা যাচ্ছে, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট। খোল বরাবর ওগুলোর দিকে এগোল ও, মুখ তুলে খুঁজছে কিছু।

দম আটকাল রানা। হ্যাঁ, আছে জিনিসটা-ওয়াটারলাইনের নীচে চওড়া একটা হ্যাচের উঁচু রেখা। হাতড়াল ওটা, মাপ নিচ্ছে। বারো বর্গফুটের মত, মাঝখান থেকে খোলে। এক মুহূর্ত স্থির হলো ও, ভাবছে বন্ধ দরজার ভিতর কী আছে। সুইচ অন করে স্টিল প্লেটের গায়ে সেঁটে ধরল গাইগার কাউন্টার। বাঁ কবজিতে বাঁধা মিটারে চোখ। কাঁটাটা কেঁপে উঠল, অর্থাৎ জানা গেল মেশিনটা সচল। তবে অল্পই রেজিস্টার করল। খোল থেকে এটুকু আশাই করা যায়, বলেছে অনিল।

নাহ্, আশপাশে কোথাও নেই বোমা দুটো। বোতাম টিপে মেশিন বন্ধ করে

দিল রানা। এবার ফিরতে হয়।

কানের পাশে মৃদু ঝঙ্কার আর বাম কাঁধে আকস্মিক টানটা একই সঙ্গে অনুভব করল রানা। লাফ দিয়ে খোলের কাছ থেকে পিছিয়ে এল ও। ওর নীচে উজ্জ্বল ফলা সহ বল্লমটা মৃদু কাঁপন তুলে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে গভীরে। বন্ করে ঘুরল রানা।

চাঁদের আলোয় লোকটার কালো রাবারের সুট আর্মার-এর মত চকচক করছে। ভেসে থাকার জন্য পানিতে ঘন-ঘন পা ছুঁড়ছে সে, ডানহাত ব্যস্ত হারপুন গানের ব্যারেলে আরেকটা বল্লম আটকাতে। পায়ের স্লিপার ঝাপটে তার দিকে এগোল রানা।

লোডিং লিভার টেনে নিয়ে ওর দিকে হারপুন তাক করল লোকটা। রানা জানে সময় মত তার নাগাল পাবে না। আরও পাঁচ গজ দূরে শত্রু।

হঠাৎ থেমে মাথা নিচু করল রানা, ডিগবাজি খেয়ে পা ছুঁড়ল, লোকটার নীচে পৌঁছতে চায়। গ্যাসের নিঃশব্দ বিস্ফোরণ সামান্য শক-ওয়েভ তৈরি করল, একই সঙ্গে পায়ে কিছু একটা লাগার অনুভূতি হলো ওর। এখনই! লোকটার নীচ থেকে সবেগে উপরে উঠছে রানা, কাস্তে চালাবার ভঙ্গিতে ছুরিটা ঘোরাল।

টার্গেটের নাগাল পেয়ে ভিতরে ঢুকল ফলা। কালো রাবার ঠেকল ওর হাতে। পরমুহূর্তে হারপুন গানের বাঁটের বাড়ি খেল কানের পিছনে, সেই সঙ্গে তামাটে একটা হাত ছুটে এসে মাস্কের কাছে ওর এয়ার-পাইপ চেপে ধরল।

উন্মত্তের মত ছুরি চালাচ্ছে রানা, বারবার। কিন্তু পানির ভিতর ওর হাত নড়ছে মন্থরবেগে। ফলার ডগা কিছু একটা ছিঁড়ল। তামাটে হাত পাইপ ছেড়ে দিল, কিন্তু এখন কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। গানের বাঁটটা আবার আঘাত করল ওর মাথায়। কালো ধোঁয়ায় ভরে গেল পানি—জিনিসটা ভারি, ঘন, চটচটে, ওর মাস্কের কাঁচে লেপ্টে গেছে।

ব্যথায় কাতর, ধীরে ধীরে পিছু হটছে রানা, কাঁচে হাত ঘষছে। অবশেষে পরিষ্কার হলো কাঁচটা। দেখতে পেল, কালো ধোঁয়ার উৎস লোকটা, গলগল করে বেরুচ্ছে তার পেট থেকে। কিন্তু হারপুন গান আবার অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে, যেন এক টন ওজন ওটার, বর্শার মাথায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল ফলাটা। তবে ফিন পরা পা দুটো সামান্যই নাড়তে পারছে লোকটা, ডুবতে শুরু করে রানার লেভেলে নেমে আসছে সে।

রানাও নিজের হাত-পাকে কথা শোনাতে পারছে না, সীসার মত ভারী হয়ে উঠেছে একেকটা। চোখের দৃষ্টি আর চিন্তাশক্তি কমে আসছে বুঝতে পেরে মাথাটা বার কয়েক ঝাঁকাল ও, কিন্তু তারপরও হাত দুটো নির্দেশ মত দ্রুত কিছু করতে পারছে না। গতি নেই, ফ্লিপারগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এখন

প্রতিপক্ষের রাবার মাউথপিসের ভিতরে বেরিয়ে পড়া দাঁতগুলো দেখতে পাচ্ছে। হারপুনের ফলা ওর মাথায় ঠেকল, গলায় নামল, স্থির হলো বুকে।

অসহ্য ধীর গতিতে নিজের বুকের কাছে উঠে আসছে রানার হাত, জানে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে হারপুন গান, তা না হলে মৃত্যু অবধারিত। অথচ গতি নেই পায়ে, শক্তি নেই হাতে।

আর ঠিক তখন, অকস্মাৎ, ঝাঁকি খেয়ে রানার দিকে সরে এল লোকটা, যেন লাথি খেয়েছে পিঠে। হাত দুটো এমন ভাবে মেলে দিল, মনে হলো আলিঙ্গন করতে চায় রানাকে। ছেড়ে দেওয়ায় ওদের মাঝখান থেকে পাক খেতে খেতে নীচে তলিয়ে যাচ্ছে হারপুন গানটা। লোকটার পিছন থেকে কালো রক্তের একটা ছোট মেঘ সাগরে ছড়িয়ে পড়ছে, হাত দুটোর ভাষায় অস্পষ্ট আত্মসমর্পণের আভাস, একই সময়ে মাথাটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে তার এই অবস্থার জন্য কে বা কী দায়ী।

এই মুহূর্তে, লোকটার পিঠ থেকে কয়েক গজ দূরে, ওটার চোয়াল থেকে সুট আর্মারের কালো রাবার খানিকটা ঝুলে রয়েছে। ব্যারাকুডাটাকে দেখতে পেল রানা। পানিতে আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে ওটা, সাত কি আট ফুটী রুপালি-নীল টর্পেডো। ওটার চোয়ালের চারদিকে রক্তের পাতলা একটা কুয়াশা মত ছড়িয়ে রয়েছে, পানিতে রক্তের এই স্বাদই আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছে ওটাকে।

বাঘের মত চোখ দুটো এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে, তারপর অলস ভঙ্গিতে লোকটার দিকে তাকাল। প্রকাণ্ড হাই তোলার অনুকরণে চোয়াল ফাঁক করল ওটা, আসলে ঢোক গিলে পেটে চালান করে দিল ছেঁড়া রাবারের সঙ্গে মাংসের টুকরোটা। তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও খানিকটা ঘুরল, পুরোটা দৈর্ঘ্য কাঁপিয়ে সাদা বিদ্যুচ্চমকের মত ডাইভ দিল নীচে। সবটুকু খোলা চোয়াল নিয়ে লোকটার ডান কাঁধে আঘাত করল ওটা, কামড় বসিয়ে ঝাঁকাল একবার, বিড়াল যেমন ইঁদুরকে মুখে নিয়ে ঝাঁকি দেয়, তারপর পিছিয়ে গেল। রানা অনুভব করল পেটের ভিতর থেকে গলিত লাভার মত উপরে উঠে আসতে চাইছে বমি। অনেক কষ্টে সেটাকে ঠেকাল ও, ধীরে ধীরে ঘুরে ফিরতি পথ ধরছে।

অল্প কয়েক গজ এগিয়েছে রানা, এই সময় ওর বাম দিকের সারফেসে কিছু একটা আঘাত করল। গায়ে চাঁদের আলো নিয়ে অ্যালুমিনিয়াম রঙের একটা ডিম অলস ভঙ্গিতে বার বার পাক খেয়ে নেমে যাচ্ছে নীচে। জিনিসটা কী বুঝল না রানা, মাথাও ঘামাল না। কিন্তু আরও দুই গজ এগোবার পর অকস্মাৎ পেটে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল ও, শরীরটা কাত হয়ে গেল। কী ঘটেছে টের পেয়ে নিজের অজান্তে তাড়াতাড়ি সাঁতরাতে শুরু করল, যত দ্রুত পারা যায় নেমে

যাচ্ছে সাগরের তলায়। একের পর এক আরও শক-ওয়েভ ধাক্কা দিল ওকে, তবে গ্রেনেডগুলো ফেলা হচ্ছে ইয়টের খোলের কাছাকাছি রক্তের রঙ দেখে। ধীরে ধীরে বিস্ফোরণের ধাক্কা ও সংখ্যা কমে এল।

তলাটা দৃষ্টিসীমার ভিতর চলে আসছে। ঢেউ খেলানো ঘাস। ঝাঁক-ঝাঁক ছোট মাছ রানার সঙ্গে পালাতে ব্যস্ত। এখন সবটুকু শক্তিতে সাঁতরাচ্ছে ও। যে-কোনও মুহূর্তে ইয়টের কিনারা থেকে পানিতে নামানো হবে একটা বোট, সেটা থেকে নীচে নামবে আরেকজন ডাইভার। ওকে না দেখতে পেলে লোকটা জানবে কীভাবে যে কেউ এসেছিল, ধরেই নেবে তাদের আন্ডারওয়াটার সেন্ট্রিকে খুন করেছে কোনও হাঙর কিংবা ব্যারাকুডা। দেখার বিষয় হবে হারবার পুলিশকে কী রিপোর্ট করে ধনঞ্জয় ভূপতি। বন্দরের শান্তিময় পরিবেশে একটা প্লেজার ইয়ট থেকে কী কারণে সশস্ত্র আন্ডারওয়াটার সেন্ট্রিকে ডিউটিতে পাঠানো হয়েছিল, এটা ব্যাখ্যা করা ওর পক্ষে বেশ কঠিনই হবে।

দোল খাওয়া ঘাসের উপর দিয়ে সাঁতার কাটছে রানা। ওর মাথাটা খুব ব্যথা করছে। সাবধানে, আলতোভাবে একটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারল, দুই জায়গার চামড়া ছড়ে গেছে। তবে না, কোনও ক্ষতের সৃষ্টি হয়নি। পানির কুশন ছিল বলেই রক্ষে, তা না হলে হারপুন গানের বাঁটের ওই দুটো বাড়ি ওকে নির্ঘাত অজ্ঞান করে ফেলত। এখনও যেন একটা ঘোরের ভিতর রয়েছে ও।

সামুদ্রিক ঘাসের শেষ প্রান্তে পৌঁছে চাঁদের আলোটাকে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখল রানা। দৃষ্টিসীমার কিনারায় একটা আলোড়ন ওঠায় ঘোরটা কেটে গেল ওর। প্রকাণ্ড একটা মাছ পাশ কাটাচ্ছে ওকে। এ সেই ব্যারাকুডা! ওটা যেন পাগল হয়ে গেছে। এগোচ্ছে ঠিকই, তবে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে নিজের লেজ কামড়াতে চেষ্টা করছে। লম্বা শরীরটা কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ঘন ঘন, সিধে হচ্ছে, মোচড় খাচ্ছে; যেন একটা খিঁচুনির কারণে মুখটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে বারবার। ধূসর কুয়াশার ভিতর ওটাকে হারিয়ে যেতে দেখল রানা। সাগরের এই প্রতাপশালী মাছের এরকম করুণ পরিণতি দেখে মনটা একটু যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল ওর। দৃশ্যটার মধ্যে অশ্লীল কী যেন একটা আছে। কোনও একটা বিস্ফোরণ নিশ্চয়ই নার্ভ সেন্টারে আঘাত করেছে, মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম আর জটিল কোনও মেকানিজম ঠিকমত কাজ করছে না। বেশিক্ষণ টিকবে না ওটা। শীঘ্রি আর সব মাছ টের পেয়ে যাবে ওর দুর্বলতার কথা।

দ্রুত সাঁতার কেটে ফিরছে রানা।

বারো

হারবার পুলিশের জেটিতে উঠে কাপড়চোপড় পরল রানা, হোটেলে ফিরে এসে ফোন করল অনিলকে।

দু'মিনিটের মধ্যে ওর স্যুইটে চলে এল সে, উত্তেজনায় টগবগ করছে। অনর্গল এক নিঃশ্বাসে যা বলে গেল তার সংক্ষেপ হলো:

লোকটার নাম রামনাম সাচ্চা, ধনঞ্জয় ভূপতির একজন শেয়ারহোল্ডার। অন্তত পাসপোর্টে তাই লেখা হয়েছে। কিন্তু আজ রাতে ক্লাবে তাকে চেনা-চেনা লাগায় সুপারকমপিউটার, অর্থাৎ নিজের মাথাটাকে একটু খাটাতেই মনে পড়ে গেছে অনিলের সব। ওর আসল নাম কুমারেশ লাহিড়ী, ভারতীয়, ফিজিসিস্ট। ভারতীয় হলে কী হবে, টাকার লোভে পাকিস্তানের কাছে আণবিক গবেষণার টপ সিক্রেট কাগজ-পত্র বিক্রির অভিযোগে আণবিক কমিশনের চাকরিটা হারায় সে। প্রমাণের অভাবে তার শাস্তি হয়নি ঠিকই, তবে ভাল কোথাও চাকরি আর পায়নি সে। তার সম্পর্কে শেষ খবর জানত অনিল, পাকিস্তান হয়ে ইরানে গিয়েছিল সে, তারপর তাকে সিঙ্গাপুরে দেখা গেছে।

'চিন্তার বিষয়, অনিল,' সব শুনে গম্ভীর হলো রানা। 'একজন ফিজিসিস্ট জলপরীতে কী করছে? এদিকে ইয়টের তলায় আমি কী দেখে এসেছি শোনো।'

রানার বর্ণনা শোনার পর অনিল জানতে চাইল, 'এখন তা হলে কী করব আমরা? লিমপেট মাইন ফাটিয়ে ডুবিয়ে দেব ইয়টটাকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা অপেক্ষা করব।' অনিল প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলল ও। 'মিসাইল ঘাঁটির এয়ার স্ট্রিপে একটা অ্যামফিবিয়ান প্লেন আনাবার ব্যবস্থা করো। মেসেজ পাঠাও, মাউি যেন রেডি থাকে, দরকার হতে পারে। আর জলপরীর ওপর আড়াল থেকে চোখ রাখার ব্যবস্থা করো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার প্ল্যান মেনে নিল অনিল। তবে জানতে চাইল, 'সি-প্লেন কী হবে?'

'কাল আমরা সাগরের এক-দেড়শো মাইল এলাকা চষে ফেলব। জমিনে মিগটা নেই বলেই আমার ধারণা। থাকলে আছে পানিতে। হয়তো অগভীর কোথাও ডুবিয়ে রেখেছে। আবহাওয়া এখন একদম শান্ত, এদিকে থাকলে ওটাকে আমাদের খুঁজে পাওয়া উচিত। তবে একটা ব্যাপারে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।'

'কী?'

'ভূপতি যদি টের পায় আমরা তার জন্যে বিপদ হয়ে উঠছি, হঠাৎ হামলা করে বসতে পারে সে। প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের প্রতি মুহূর্ত।'

'মাভৈ বলো, ভাই, মাভৈ বলো!' বলল অনিল, হাসছে।

ডিফেন্স আইল্যান্ড থেকে আকাশে উঠল ওদের সি-প্লেন, অ্যামফিবিয়ান টু-ফোর। কোলের উপর অ্যাডমিরাল্টি চার্ট নিয়ে বসেছে রানা। উত্তর-পুব কোর্স ধরে ছুটছে প্লেন। নরকোন্দাম, যেখানে গুপ্তধন হিসেবে টন-টন সোনা পাওয়া যাবে বলে প্রচার করছে ধনঞ্জয় ভূপতি, প্রথমে ওদিকটায় তল্লাশি চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা।

চার্ট থেকে মুখ তুলে রানা বলল, 'স্রেফ সময়ের অপচয়, বুঝলে। নরকোন্দামের চারপাশে, অন্তত একশো মাইলের মধ্যে, সাগরের গভীরতা এত বেশি যে কোন জাহাজ ডুবলে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ভূপতি মিথ্যে কথা রটিয়েছে।'

তারপরও দ্বীপটার চারপাশে দু'বার চক্কর দিল ওরা, এক হাজার ফুট উপর থেকে। শান্ত সাগরের নীচে কিছুই দেখা গেল না। সাগরের তলা এখানে কয়েক শো ফুট গভীর।

চক্কর দেওয়ার সময় অনিলকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'জলপরীর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল অনিল। 'পুলিশ কমিশনার খগেন মিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন। দু'জন লোক চোখে বিনকিউলার সেঁটে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেবে। কোথাও যেতে দেখলে মিসাইল ঘাঁটিতে ফোন করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উঠবে একটা হেলিকপ্টার।'

'মাভৈ-এর ক্যাপটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছ?'

'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমি নিজে কথা বলেছি। আজ সন্ধ্যার পর পোর্ট ব্লেয়ারে আসছে ওটা।'

পনেরো মিনিট পর কোকো চ্যানেলের উপর, গ্রেট কোকো দ্বীপের কাছাকাছি চলে এল ওদের অ্যামফিবিয়ান। সাগরের এ দিকটায় মাছের অসংখ্য ঝাঁক দেখা যাচ্ছে। প্লেন লুকিয়ে রাখার জন্য আদর্শ জায়গা। আরও কয়েক মাইল সামনে পানি এত স্বচ্ছ যে বড় আকারের মাছগুলোকে চল্লিশ ফুট নীচেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, প্রবালের গাঢ় ঝোপগুলোর ভিতরে উঁকি মারছে, নাক দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে সুস্বাদু শিকারের সন্ধানে।

'আরও একটু নীচে নামো, অনিল,' বলল রানা।

খানিক পর আরও স্পষ্ট হলো দৃশ্যটা। বালির উপর সবুজ ঘাস দোল খাচ্ছে। পানপাতা আকৃতির একটা মান্তা রে মাছ দ্রুত বেগে ছোটার সময় নীচের বালিতে ঠিক যেন একটা মিগ-উনত্রিশের গাঢ় ছায়া দেখতে পেল রানা। হাসল রানা চোখের ভুল মনে করে।

এদিকে দেখবার মত আর কিছু নেই, এমন কোন জায়গাও নেই যে কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে। কোর্স বদলে মিসাইল ঘাঁটির দিকে ফিরছে অনিল। রানাকে চিন্তিত দেখে সে বলল, 'আরও ফুয়েল নিয়ে দুপুরের পর আবার আসা যাবে, কী বলো?'

রানার মনের খুব গভীরে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি, একটা খুঁতখুঁতে ভাব তৈরি হয়েছে। কিছু একটা, নগণ্যই হবে, খুদে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে। কী ছিল সেটা? বড় মাছ... হ্যাঁ, ওই হাঙরগুলো! চল্লিশ ফুট পানির নীচে চক্কর মারছিল ওগুলো। কী করছিল ওখানে? তিনটে হাঙর। নিশ্চয়ই কিছু আছে ওখানে...মৃত কিছু, যে কারণে নির্দিষ্ট ওই বালির বিস্তৃতি আর প্রবালের তৈরি ঝোপগুলোর গায়ে গুঁতো মারছিল। হঠাৎ জরুরি তাগাদার সুরে অনিলকে বলল রানা, 'প্লেন ঘোরাও, অনিল! ওই হাঙরগুলোকে আরেকবার দেখতে চাই। ওখানে কী যেন একটা...'

ছোট প্লেনটা ইউ টার্ন নিয়ে কোকো চ্যানেলের দিকে ফিরছে। ইঞ্জিনের শক্তি কমিয়ে সারফেসের আরও কাছাকাছি নামিয়ে আনল অনিল প্লেনটাকে, সাগর থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে। দরজা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকল রানা, শর্ট ফোকাসের জন্য অ্যাডজাস্ট করল বিনকিউলার।

হ্যাঁ, ওই তো হাঙরগুলো এখনও ওখানে রয়েছে। ডরসল ফিন পানির ওপর তুলে দুটো সারফেসে, একটা তলায়। তলারটা নাক দিয়ে কী যেন গুঁতাচ্ছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে কিছু একটা টানছে। গাঢ় আর ম্লান নানা রকম দাগের মাঝখানে সরু একটা সরল রেখা দেখা যাচ্ছে সাগরের মেঝেতে। গলা চড়িয়ে রানা বলল, 'এই জায়গার ওপর ফেরো আবার!'

ইউ টার্ন নিয়ে আবার ফিরল প্লেন। ধ্যাত্, প্লেনের গতি আরেকটু কম হলে ভাল হোত! তবে এবার রানা সাগরের তলায় আরেকটা সরল রেখা দেখতে পেল, প্রথম রেখাটা থেকে নব্বুই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে আরেক দিকে চলে গেছে। নিজের সিটে সিধে হয়ে বসল ও, টান দিয়ে সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'ওই হাঙরগুলোর কাছে নামো, অনিল। আমার ধারণা: এই জায়গাতেই।'

চট করে রানার মুখের দিকে একবার তাকাল অনিল। তারপর বলল, 'ভগবান!' আবার প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে নাকটা নিচু করল সে। সামান্য একটু ঝাঁকি খেল ওরা, স্কিডের নীচে হিস-হিস করে উঠল পানি। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল

অনিল, প্রেমও একটু পর থেমে গেল, রানা যেখানে চেয়েছিল তার দশ গজের মধ্যে, নিজেরই তৈরি ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে মৃদু।

সারফেসের হাঙর দুটো ওদেরকে গ্রাহ্যই করছে না। নিজেদের বৃত্তটা সম্পূর্ণ করল ওগুলো, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। প্লেনটাকে এত কাছ থেকে পাশ কাটাল, ওগুলোর লালচে-বেগুনি বোতামের মত নির্লিপ্ত চোখ পরিষ্কার দেখতে পেল রানা।

হাঙর দুটোর তৈরি করা ছোট ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে নীচে তাকাল ও। হ্যাঁ! তলার পাথর আর প্রবালের ঝোপ আসল নয়, নকল। ওগুলো আঁকা হয়েছে। বালির বিস্তৃতিটুকুও তাই! এখন রানা বিশাল একটা তারপুলিনের সরল কিনারাগুলোও দেখতে পাচ্ছে। তৃতীয় হাঙর ওটার বড় একটা অংশ সরিয়ে ফেলেছে। এখন নিজের চ্যাপ্টা মাথা ভিতরে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

সিধে হয়ে বসল রানা। অনিলের দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকাল ও। 'আর কোন সন্দেহ নেই। এখানেই আছে তোমাদের মিগ। বড়সড় একটা তারপুলিনের নীচে। তাকিয়ে দেখো।'

রানার গায়ের উপর ঝুঁকে নীচে তাকাল অনিল।

এই মুহূর্তে রানার মাথায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই পুলিশ ফ্রিকোয়েন্সিতে কান পেতে আছে ভূপতি, কাজেই ঢাকা বা দিল্লিকে এখনই কিছু জানানো উচিত হবে না। নীচে নেমে আগে দেখা দরকার বোমাগুলো ওই প্লেনে আছে কিনা। কিন্তু হাঙরগুলো? একটাকে জখম করো, বাকি দুটো ওটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

সিধে হলো অনিল। 'কী সাংঘাতিক! কী ভয়ঙ্কর! মাইরি বলছি, সত্যি দেখালে বটে, রানা!' রানার কাঁধে চাপড় মারল সে। 'শালার মিগটাকে পেয়ে গেছি আমরা! ভাবা যায়? ভগবান, ও ভগবান!'

রানার হাতে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে। চেম্বারে বুলেট আছে কিনা দেখে নিল ও, হাঙর দুটোর ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। প্রথমটা আকারে বড়, প্রায় বারো ফুট লম্বা একটা হ্যামারহেড। পানি কেটে এগোবার সময় ওটার ভীতিকর হাতুড়ি-মাথা ধীর ভঙ্গিতে একদিক থেকে আরেকদিকে ঘোরে, তাকিয়ে দেখছে কী ঘটছে নীচে, অপেক্ষা করছে মাংসের আভাস পাওয়ার জন্য। ডরসল ফিনের গোড়ায় লক্ষ্যস্থির করল রানা। পুরোপুরি খাড়া হয়ে আছে ওটা, উত্তেজনা আর সচেতনতার প্রকাশ। শিরদাঁড়াটা ওটার ঠিক নীচেই।

ট্রিগার টেনে দিল রানা। ঠিক ফিনটার গোড়ায় পানিতে লাগল বুলেট। থারটি-এইট বুলেটের গর্জন সাগরের উপর দিয়ে অবাধে ভেসে গেল অনেক দূর। গ্রাহ্য করল না হ্যামারহেড। আবার গুলি করল রানা। এবার মাছটা

সারফেসের উপর মাথা চাড়া দিয়ে পানিতে ফেনা তৈরি হলো। ডাইভ দিল ওটা, তবে গভীরে না নেমে মোচড় খাওয়া সাপের মত কাত হয়ে গেল। ছটফট করল অল্প একটু। একটা বুলেট নিশ্চয়ই স্পাইনাল কর্ড জখম করেছে। খয়েরি রঙের প্রকাণ্ড আকৃতি আবার বৃত্ত তৈরি করছে, এবার ধীরে ধীরে, ক্রমশ বড় হচ্ছে প্রতিটি বৃত্ত। মুহূর্তের জন্য চিৎ হলো ওটা, রোদ লাগল সাদা পেটে। তারপর আবার সিধে হয়ে বৃত্ত তৈরির জন্য সাঁতরাতে লাগল—স্রেফ অভ্যাসবশে, দম দেওয়া খেলনার মত।

পিছু নেওয়া দ্বিতীয় হাঙরটা গভীর মনোযোগে সবই দেখেছে। এখন সাবধানে এগোল ওটা। হঠাৎ ছুটে এল, কিন্তু আঘাত না করে বেরিয়ে গেল পাশ কেটে। কোনও বিপদ ঘটল না দেখে আবার ছুটে এল, এবার গুঁতো মারল নাক দিয়ে। প্রতিপক্ষ বাধা দিচ্ছে না। এরপর সমস্ত শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, হ্যামারহেডের পাশ থেকে মাংস আর চর্বি ছিঁড়ে এনে গোগ্রাসে গিলছে। রক্তের মেঘ তৈরি হলো সাগরে। কাণ্ড দেখে এবার নীচ থেকে উঠে এল তৃতীয় হাঙরটা। কে কত দ্রুত, কত বড় টুকরো ছিঁড়ে আনতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। স্রোতের টান সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গোটা দৃশ্যটাকে।

পিস্তলটা অনিলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আমি নীচে নামছি। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হবে ওখানে। আধ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকার রসদ আছে ওগুলোর, তবু যদি দেখো ফিরে আসছে, একটাকে আহত করবে। আর যদি মনে করো সারফেসে আমার উঠে আসা দরকার, সোজা নীচের দিকে গুলি করবে, একের পর এক। এই দূরত্বে শক-ওয়েভ ঠিকই আমার কাছে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়।'

অনিলের সাহায্যে অ্যাকুয়ালাঙ পরে নিল রানা। ইতিমধ্যে স্রোতের সঙ্গে ভেসে একশো গজের মত সরে এসেছে ওদের সি-প্লেন, আবার স্টার্ট দিয়ে সেটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল অনিল। পানিতে নেমে ডুব দিল রানা।

সোজা তারপুলিন লক্ষ্য করে নামল ও, ঠিক যেখানে হাঙর ওটাকে এলোমেলো করে রেখেছে। লোহার কয়েকটা লম্বা গোঁজ টেনে-হিঁচড়ে বালি থেকে বের করল। ওয়াটারপ্রুফ টর্চ জ্বালল, অপর হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরিটা, কিনারা দিয়ে ঢুকে পড়ল তেরপলের নীচে।

এরকম কিছুই আছে বলে জানা ছিল, তারপরেও ঘোলাটে, দূষিত পানি দেখে বমি পেল ওর। ভাইজরটা পরিষ্কার করে আবার এগোল ও, পৌঁছাল প্লেনটা যেখানে তারপুলিনকে তাঁবুর মত উঁচু করে রেখেছে। পায়ের উপর ভর দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। ডানার নীচে রয়েছে ও। উপরে উঠে ইমার্জেন্সি ডোরটা খুলল। ভিতরে লাশটার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে ভিড় করে রয়েছে কাঁকড়া, সি

ক্যাটারপিলার আর স্টারফিশ। এটার জন্যও তৈরি ছিল ও। হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিল নোংরা কাজটায়।

বেশিক্ষণ লাগল না ওর। ক্লিপ খুলে সোনালি আইডি ডিস্কটা মুঠোয় ভরল, তারপর পাইলটের পচন ধরা কবজি থেকে খুলে নিল সোনালি রিস্টওয়াচ। চিবুকের নীচে খোলা ক্ষতটা লক্ষ করল ও, দেখেই বুঝল, এটার জন্য কোন সামুদ্রিক প্রাণী দায়ী নয়।

টর্চের আলো ফেলল সোনালি ডিস্কে। তাতে লেখা রয়েছে–কৃষ্ণকান্ত তিওয়ারি। নাম্বার ২৩০৫১।

প্রমাণ দুটো স্ট্র্যাপ দিয়ে নিজের কবজিতে আটকে নিয়ে ফিউযিলাজের দিকে এগোল রানা। আবছা অন্ধকারে প্রকাণ্ড সিলভার সাবমেরিনের মত ঝুলে রয়েছে ওটা। বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে ভিতরটা পরীক্ষা করল ও, দেখল সংঘর্ষের ফলে কোথায় কতটুকু ভেঙেছে, তারপর খোলা সেফটি হ্যাচ গলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ভিতরে লাল চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট বড় মাছের দল, তাদের মধ্যে অক্টোপাসও রয়েছে বেশ কয়েকটা। ক্রুদের ক্ষতবিক্ষত লাশগুলো ছাদে ঠেকে আছে, প্রতি লাশকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য মাছ আর অক্টোপাস। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। লাল ডোরা কাটা সায়ানাইড ক্যানিস্টারটা দেখতে পেয়ে তুলে বেল্টে গুঁজল। লাশগুলো গুণল, বম বে-র খোলা হ্যাচ দিয়ে তাকিয়ে দেখল বোমাগুলো নেই। পাইলটের সিটের নীচে, খোলা কন্টেইনার ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় খুঁজল, কিন্তু বোমার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ফিউজগুলো পেল না।

অনেক কিছুই নেওয়ার আছে, কিন্তু দূষিত পানিতে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছে না রানা। প্লেন থেকে নেমে এল ও। তারপর তেরপলের নীচ থেকে বেরিয়ে উঠে এল সারফেসে।

তেরো

পোর্ট ব্লেয়ারে ফেরার সময় সি-প্লেনকে উইমবারলিগঞ্জের উপর দিয়ে নিয়ে যেতে বলল রানা, জলপরীকে একবার দেখে যাবে। দেখা গেল জায়গা মতই রয়েছে ওটা, ঠিক যেখানে আগের দিন ছিল। একমাত্র পার্থক্য হলো, যার কোন তাৎপর্য নেই, ওটার শুধু বো-র নোঙরটা পানিতে ফেলা হয়েছে। শান্ত সাগর যেন আয়না, তাতে ছায়া পড়েছে জলপরীর, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে–ক্ষতিকর বা অশুভ

বলে মনেই হচ্ছে না।

হঠাৎ পাশ থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে অনিল বলল, 'রানা, সৈকতে তাকাও! ষে বরাবর বোটহাউসের পাশে। দেখতে পাচ্ছ জোড়া ট্র্যাক পানিতে নেমে এসেছে? বোট হাউসের দরজা থেকে শুরু।'

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাতেই দেখতে পেল রানা। ওর দৃষ্টিতেও সমান্তরাল দাগ দুটো অদ্ভুত লাগল। বেশ গভীর। বোটহাউস থেকে সাগরের দিকে ভারী কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু না, হতে পারে না! না, অসম্ভব! 'চলো, অনিল, তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ি।' উইমবারলিগঞ্জকে পিছনে ফেলে এসে আবার বলল ও, 'ভাবতে পারছি না অন্য আর কী দিয়ে ওই দাগ হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হবে, দাগগুলো ওদের তাড়াতাড়ি মুছে ফেলার কথা না?'

'মানুষ ভুল করে,' বলল অনিল। 'ওখানে গিয়ে একবার দেখা দরকার। মিস্টার ভূপতির কাছে আমি আমার মক্কেল মিস্টার সাপুড়ের তরফ থেকে জায়গাটা একবার দেখে আসার অনুমতি চাইব।'

সি-প্লেন মিসাইল ঘাঁটিতে ফিরিয়ে দিয়ে পুলিশের হেডকোয়ার্টারে ফিরতে বেলা একটা বেজে গেল ওদের। কয়েকটা নতুন রিপোর্ট অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। আজ বিকেল পাঁচটায় পৌছাচ্ছে ভারতীয় সাবমেরিন মাঈভে। ইন্টারপোল আর ভারতীয় মেইনল্যান্ডের পুলিশ জানিয়েছে, কৃষ্ণকান্ত তিওয়ারি আর তৃষ্ণা কান্তা তিওয়ারি পরস্পরের আপন ভাই-বোন। ইন্টারপোল আরও জানিয়েছে, ধনঞ্জয় ভূপতি একজন বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার হলেও, তাকে ক্রিমিনাল বলেও সন্দেহ করা হয়, তবে তার বিরুদ্ধে এখনও সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। তার শেয়ারহোল্ডারদের সম্পর্কে নতুন কিছু জানা যায়নি, তবে এমন হতে পারে যে এরা সবাই নিজেদের পরিচয় গোপন করছে। আর কুমারেশ লাহিড়ী সম্পর্কে বলা হয়েছে, শেষবার তাকে সিঙ্গাপুরে দেখা গেছে, তবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ গা ঢাকা দেয় সে।

হোটেলে ফেরার পথে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছাল ওরা, রানার তরফ থেকে উইমবারলিগঞ্জে ভূপতির ভাড়া নেওয়া জায়গাটা দেখতে যাবে অনিল, কাভার স্টোরি বহাল রেখে। সেই সুযোগে বোট হাউস আর দাগগুলো দেখে আসবে সে। তারপর ঠিক পাঁচটার সময় সাবমেরিন মাঈভে-এ পৌছাবে ওরা, জলপরী রওনা হলে ধাওয়া করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে।

নিজের স্যুইটে ফিরে এক জোড়া স্যান্ডউইচ আর হুইস্কির অর্ডার দিল রানা। খাওয়া মাত্র শেষ করেছে, এই সময় পুলিশ কমিশনার খগেন মিত্র টেলিফোন করলেন। এইমাত্র তাঁর ইনফরমাররা রিপোর্ট করেছে—আজ সকালে

অয়েলিং জেটিতে ভিড়ে ট্যাংকে তেল ভরেছে জলপরী। আর আধ ঘণ্টা হলো জলপরীর সি-প্লেনটাকে পানিতে নামানো হয়, মিস্টার ভূপতি আর তাঁর এক সঙ্গী সেটায় চড়ে পুবদিকে চলে গেছেন।

এই রিপোর্ট পাওয়ার পর কমিশনার এয়ার স্ট্রিপের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের রেইডারে ওটাকে দেখা যাচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। যাচ্ছিল দেখা, তবে মিস্টার ভূপতির সি-প্লেন খুব নিচু দিয়ে, সারফেস থেকে মাত্র তিনশো ফুট উপর দিয়ে ওড়ার কারণে রেইডার সেটাকে হারিয়ে ফেলে।

খবরগুলো ইন্টারকমের মাধ্যমে অনিলকে জানিয়ে দিয়ে উইমবারলিগঞ্জে, তৃষ্ণাকে টেলিফোন করল রানা। ওর গলার আওয়াজ পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মেয়েটি। সারাটা সকাল কোথায় ছিলেন আপনি, বাবুরাম? হোটেলে বারবার ফোন করেও আপনাকে পাওয়া যায় না কেন? শুনুন, আজ বিকেলে আপনাকে আমার দরকার, একসঙ্গে সাঁতার কাটব। জানেন, নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে ইয়টে উঠতে বলা হয়েছে আমাকে। ভূপতি বলছে আজ রাতে গুপ্তধন উদ্ধার করতে যাবে তারা। এটা একটা দারুণ ব্যাপার না-আমাকেও সঙ্গে নিতে চাইছে? তবে এ-সব কিন্তু একদম গোপন তথ্য, কাজেই কাউকে বলবেন না। কখন ফিরবে সেটা ভূপতি আমাকে পরিষ্কার করে বলেনি। চেন্নাই সম্পর্কে কী যেন একটা বলছিল। ওখান থেকে কখন ফিরতে পারব জানি না, তাই ভাবছি ফিরে হয়তো দেখব আপনি ব্যাঙ্ককে চলে গেছেন। একটু অবাকই হয়েছি, আপনি আমার সঙ্গে আর দেখাই করলেন না। কাল রাতেও তো হঠাৎ করে চলে গেলেন। কেন বলুন তো?

রানা জানাল, কাল হঠাৎ ওর মাথাটা ধরেছিল। সাঁতার কাটতে চায় ও, কিন্তু কোথায় যেতে হবে?

কীভাবে কোথায় পৌঁছাতে হবে জানিয়ে দিল তৃষ্ণা। উইমবারলিগঞ্জ উপকূল থেকে এক মাইল উত্তরে সৈকতটা। মেঠো পথ আর একটা কুঁড়ে আছে ওখানে।

একটা তোয়ালেতে সুইমিং ট্রাঙ্কটা জড়িয়ে নিল রানা। স্ল্যাকসের উপর গায়ে চড়াল গাঢ় নীল একটা সুতি শার্ট। তারপর অনির্লের গাইগার কাউন্টারটা কাঁধে ঝুলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। ক্যামেরাসহ সাধারণ একজন ট্যুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে ওকে। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে নিশ্চিত হয়ে নিল সঙ্গে পাইলটের আইডেনটিফিকেশন ব্রেসলেটটা আছে কিনা। তারপর স্যুইট থেকে বেরিয়ে এসে এলিভেটরে চড়ল।

ইন্টারকমে আগেই বলে রেখেছিল, নীচে নেমে রেন্ট-আ-কারের ল্যান্ড

৭.

রোভারটাকে গাড়ি-বারান্দায় পেল রানা। একজন পোর্টারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে।

উপকূল বরাবর রাস্তাটা কে জানে কত বছর মেরামত করা হয়নি, খানা-খন্দে পড়ে সারাক্ষণ ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। বিকেলের রোদটাও খুব জ্বালাতন করছে। সৈকতে পৌঁছে গাড়ি থামাল রানা, ভাবল পানিতে নামার পর আর উঠবে না।

কুঁড়েটা বেশি দূরে নয়, এক ঝাঁক নারকেল গাছের মাঝখানে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে পাশাপাশি দুটো চেঞ্জিং রুম পাওয়া গেল, দরজার গায়ে লেখাঃ 'মেল' আর 'ফিমেল'। মেয়েদের ঘরে নরম কাপড়ের একটা স্তূপ আর সাদা চামড়ার এক জোড়া স্যান্ডেল দেখল ও।

সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে আবার রোদে বেরিয়ে এল রানা। সৈকতটা ছোট, আধখানা চাঁদের মত দেখতে, দুদিকে পাথুরে পাহাড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মেয়েটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

সৈকত ক্রমশ ঢালু হয়ে নীলচে-সবুজ সাগরের কিনারায় থেমেছে। কিনারায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, তারপর ডাইভ দিল।

পানির নীচের দিকটা ঠাণ্ডা। সারফেসে মাথা তোলার পর আবার একবার চারদিকে চোখ বুলাল। কেউ কোথাও নেই। অলস ভঙ্গিতে সাঁতরে খোলা সাগরের দিকে এগোল, আশা করছে যে-কোন একটা অন্তরীপের আড়ালে স্কিন-ডাইভিং করতে দেখতে পাবে মেয়েটিকে। কিন্তু না, কোথাও নেই সে। দশ মিনিট পর তীরের দিকে ঘুরল রানা, ফিরে এসে পরিচ্ছন্ন খানিকটা বালির বিস্তৃতি বেছে নিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে চিত হয়ে শুলো।

কয়েক মিনিট পর কিছু একটা চোখ মেলতে বাধ্য করল রানাকে। শান্ত বে-র মাঝখানটা ধরে বুদ্বুদের একটা রেখা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। রেখাটা আরও কাছে চলে আসতে অ্যাকুয়ালাঙ ট্যাংকের হলুদ নিঃসঙ্গ সিলিন্ডার আর চকচকে মাস্কের পিছনে পতাকার মত ঢেউ খেলানো কালো চুল দেখতে পেল রানা। অগভীর পানিতে একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল মেয়েটি, মাস্ক তুলে ঝাঁঝের সুরে বলল, 'ওখানে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে না। দয়া করে এখানে এসে আমাকে উদ্ধার করো।'

সিধে হয়ে মেয়েটির কাছে হেঁটে এল রানা। অল্প পানিতে শুয়ে রয়েছে সে। রানা বলল, 'একা-একা অ্যাকুয়ালাঙ পরতে হয় না। কী ঘটেছে? কোনও হাঙর তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছিল?'

'আজেবাজে কৌতুক কোরো না তো। সি-আরচিনের কাঁটা বিঁধেছে পায়ে। যেভাবে পারো বের করে দাও। তার আগে গা থেকে এই অ্যাকুয়ালাঙ খোলো।

এত ওজন নিয়ে আমি দাঁড়াতে পারছি না।' পেটের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বাক্‌ল-এর ক্যাচ খুলল সে। 'এবার শুধু তুলে নাও এটা।'

তৃষ্ণার পিঠ থেকে সিলিন্ডার তুলে নিয়ে গাছের ছায়ায় রেখে এল রানা। ফিরে এসে দেখল পানিতে উঠে বসেছে সে, ভাঁজ করা ডান পায়ের তলা চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করছে। বলল, 'মাত্র দুটো। তবে ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে।'

হাঁটু গেড়ে বসল রানা। তৃষ্ণার পায়ের তলায় কালো দুটো বিন্দু দেখা যাচ্ছে, পরস্পরের কাছাকাছি, আঙুলের এক ইঞ্চি দূরে, পায়ের পাতায়। দাঁড়াল ও, একটা হাত বাড়াল। 'এসো। ছায়ায় বসি চলো। কাজটায় সময় লাগবে। নীচে পা ফেলো না, চাপ লাগলে আরও ভেতরে ঢুকে যাবে। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

হেসে ফেলল তৃষ্ণা। 'আমার নায়ক! ঠিক আছে। তবে শর্ত আছে। মাঝপথে ফেলে দিতে পারবে না।' হাত দুটো উঁচু করল সে। তার হাঁটুর পিছনে একটা হাত রাখল রানা, আরেকটা বগলের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে পিঠের নীচে; তারপর অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিল তাকে। এক মুহূর্ত আলোড়িত পানির উপর দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল। তার সুন্দর ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। উজ্জ্বল চোখ দুটো বলছেঃ হ্যাঁ। মাথা নিচু করে তাকে চুমো খেলো ও।

নরম ঠোঁট আটকে রাখল ওর ঠোঁট জোড়াকে, তারপর ধীরে ধীরে ছাড়ল। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, 'কাজের আগেই অগ্রিম পুরস্কার নেয়া উচিত নয়।'

'ওটা বাকিতে নিয়েছি।' রানার ডান হাতটা পিঠের নীচ দিয়ে ঘুরে ওর ভরাট ডান স্তনের উপর চলে এসেছে। ওকে শক্ত করে ধরে পানি থেকে উঠে এল রানা। নারকেল গাছের ছায়ায়, নরম বালির উপর শোয়াল। চুলে বালি লাগার ভয়ে মাথার পিছনে হাত ঢোকাল তৃষ্ণা। অপেক্ষা করছে সে, বড় বড় পাপড়ির ভিতর প্রায় লুকিয়ে রয়েছে চোখ দুটো।

বিকিনির গুলতি আকৃতির ফোলা অংশটুকু যেন তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ব্রার কাপ-এ আঁটোভাবে আটকানো সুগঠিত স্তন দুটো যেন আরও একজোড়া চোখ। লোভ দমন করে প্রায় কর্কশ সুরে বলল রানা, 'উপুড় হও।'

নির্দেশ পালন করল তৃষ্ণা। ঝুঁকে তার ডান পা ধরে উঁচু করল রানা। ওর হাতে ছোট আর কোমল লাগল সেটা, ধরা পড়া পাখির মত। বালির কণাগুলো পরিষ্কার করে আঙুল দুটো উল্টো দিকে খানিকটা বাঁকা করল ও। ছোট আকৃতির আঙুল এক থোকা লালচে-সাদা ফুলের পাপড়ির মত। ওগুলো ধরে রেখে ঝুঁকল রানা, ঠোঁট রাখল যেখানে ভাঙা কাঁটা দুটো দেখা যাচ্ছে। প্রায় মিনিট খানেক জায়গাটা চুষল ও। কাঁটার একটা ভগ্নাংশ, বালির কণার মত, বেরিয়ে এল মুখে। থুথুর সঙ্গে সেটাকে ফেলে দিল রানা।

'শোনো, তৃষ্ণা, তোমাকে খানিকটা ব্যথা দিতে না চাইলে কাজটা শেষ করতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে।'

'কত বেশি?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল তৃষ্ণা।

'সারাদিন। অত সময় নেই আমাদের হাতে। কাজেই একটু ব্যথার জন্যে তৈরি থাকো। ঠিক আছে?'

রানা অনুভব করল, তৃষ্ণার পিছনের পেশি শক্ত হলো। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

কাঁটা দুটোর চারপাশের মাংসে দাঁত বসাল রানা, যতটা সম্ভব নরম ভাবে আটকে নিয়ে খুব জোরে চুষল। ছাড়া পাওয়ার জন্য পা-টা ঝাঁকাতে শুরু করল তৃষ্ণা। থুথুর সঙ্গে কাঁটার কিছু কণা ফেলার জন্য একবার থামল রানা। ওর দাঁতের দাগ সাদা দেখাচ্ছে, আর খুদে গর্ত দুটোয় বিন্দুর মত রক্ত জমেছে। জিভ দিয়ে রক্ত পরিষ্কার করল ও। চামড়ার নীচে কালো কিছু আর প্রায় নেই বললেই চলে। বলল, 'এই বোধহয় প্রথম কোনও মেয়ের রক্ত পান করলাম। ভালই তো লাগল।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে শরীরটা মোচড়াল তৃষ্ণা, কিছু বলল না।

ব্যথাটা যে কতটা তীব্র, জানে রানা। বলল, 'এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে, তৃষ্ণা। তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। আর এক চুমুক।' পায়ের পাতায় অভয়দানসূচক একটা চুমো খেল ও, তারপর যতটা পারা যায় নরমভাবে ঠোঁট আর জিভকে কাজে লাগিয়ে দিল।

এক কি দেড় মিনিট পর কাঁটার শেষ অংশটুকু মুখ থেকে ফেলে দিল রানা। 'ঝামেলা শেষ,' বলে পা-টা নামিয়ে রাখল। 'তবে বালিতে পায়ের পাতা নামাতে পারবে না। এসো, আরেকটা লিফট দিয়ে কুঁড়েটায় পৌঁছে দিই তোমাকে। ওখানে স্যান্ডেল আছে।'

গড়িয়ে চিত হলো তৃষ্ণা। তার চোখের কালো পাপড়িগুলো ভিজে গেছে। ওগুলোর উপর একটা হাত ঘষল। 'জানো,' বলল সে, কণ্ঠস্বরে আবেগ, আর হয়তো অভিমান, 'তুমিই প্রথম পুরুষ, যে আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে।' হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সে; ভঙ্গিটা শর্তহীন আত্মসমর্পণের।

তৃষ্ণাকে বুকে তুলে নিয়ে কুঁড়ের দরজায় পৌঁছাল রানা। ভিতরে ঢুকে তাকে নামাল ও, কিন্তু তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। একটু জোর খাটাতে হলো ওকে, বলল, 'কাপড়চোপড় পরে নাও, তৃষ্ণা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'কাপড়চোপ...কিন্তু...' রানার চোখ-মুখের থমথমে ভাব দেখে থেমে গেল তৃষ্ণা। কী ব্যাপার, বাবুরাম?'

নিজেও দ্রুত কাপড় পরে নিল রানা। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'বাইরে এসো, বলছি।'

কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে নারকেল গাছের ছায়ায় দাঁড়াল রানা। পাঁচ মিনিট পর স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে তৃষ্ণাও বেরিয়ে এল, দাঁড়াল ওর সামনে। 'হঠাৎ কী হলো বলো তো? কোনও দুঃসংবাদ?'

'হ্যাঁ, খুব বড় দুঃসংবাদ।' তৃষ্ণার চোখ দুটোকে এড়িয়ে থাকছে রানা, তাকিয়ে আছে দূরে।

বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ রানাকে দেখল তৃষ্ণা। 'বুঝেছি। দুঃসংবাদটা আমার। বড় কোন আঘাত দেবে আমাকে তুমি। তুমি চলে যাচ্ছ, তাই না? ঠিক আছে, বলে ফেলো। পরিষ্কার ভাষায় বলো, কথা দিচ্ছি আমি কাঁদব না।'

রানা বলল, 'ব্যাপারটা আরও অনেক সিরিয়াস, তৃষ্ণা। আমাকে নিয়ে নয়। তোমার ভাইকে নিয়ে।'

রানা অনুভব করল তৃষ্ণার শরীর মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে কাঁপা স্বরে জানতে চাইল সে, 'থামলে কেন? বলো।'

পকেট থেকে ব্রেসলেটটা বের করে নিঃশব্দে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা।

জিনিসটা নিল তৃষ্ণা, তবে ভাল করে একবার দেখলও না কী ওটা। রানার দিক থেকে একটু ঘুরে গেল সে। 'তারমানে মারা গেছেন। কীভাবে, কী হয়েছিল?'

'সে অনেক কথা। খুব তিক্তও। এর সঙ্গে তোমার বন্ধু ধনঞ্জয় ভূপতি জড়িত। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে সে। ভারত আর চিন সরকারের তরফ থেকে ব্যাপারটা তদন্ত করার অনুরোধ পেয়ে এখানে এসেছি আমি। বাবুরাম সাপুড়ের ছদ্ম পরিচয়ে আমাকে তুমি এক ধরনের পুলিশের লোক বলতে পার। এত কথা তোমাকে জানাবার কারণ হলো, তুমি আমাকে সাহায্য না করলে হাজার হাজার, কিংবা হয়তো লাখ লাখ মানুষ মারা যাবে।'

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে তৃষ্ণা।

'ব্রেসলেটটা তোমাকে দেখাবার একমাত্র উদ্দেশ্য তুমি যাতে আমার কথা বিশ্বাস করো,' আবার বলল রানা। 'যে সিদ্ধান্তই নাও তুমি, যাই ঘটে যাক, এখন যে কথাগুলো বলব সে-সব তুমি কাউকে বলতে পারবে না।'

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমার ভাইয়ের মৃত্যুটাকে পুঁজি করে তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ!' দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বলল তৃষ্ণা। 'আমি ভাবতেও পারি না মানুষ এতটা নীচ হতে পারে। আমি তোমাকে

ঘৃণা...হ্যাঁ, ঘৃণা করি!'

রানার কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা আর কঠিন। 'তোমার ভাইকে খুন করেছে ধনঞ্জয় ভূপতি। এবার শোনো কী কারণে তাকে খুন হতে হলো।'

প্রথম থেকে যা-যা ঘটেছে, যতটুকু জানে আর আন্দাজ করতে পারে, বিশদ বলে গেল রানা, শুধু মাভেও প্রসঙ্গটা তুলল না।

ধীরে ধীরে বিষয়টার গুরুত্ব আর বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছে তৃষ্ণা, সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে তার চেহারা।

সবশেষে রানা বলল, 'এখন সমস্যা হলো, ভূপতির বিরুদ্ধে আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। বোমা দুটো কোথায় আছে তা শুধু সে আর তার লোকেরা জানে। এখন ওদেরকে গ্রেফতার করেও কোন লাভ হবে না, প্রফেশনাল ক্রিমিনালদের মুখ খোলানো যায় না। কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ? বোমাগুলো কোথায় লুকিয়েছে তা না জানা পর্যন্ত আমরা ওদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু করতে পারছি না, বিপদটাও কাটছে না। ব্ল্যাক মেইলারকে টাকা দেবে না ভারত বা চিন।'

'বুঝলাম। এখন তা হলে কী করতে হবে আমাকে?' তৃষ্ণার কণ্ঠস্বর বেসুরো শোনাল, রানার ভিতর দিয়ে সে যেন অনেক দূরের কোনও টার্গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রকারী, তার ভাইয়ের খুনি ধনঞ্জয় ভূপতির দিকে, ভাবল রানা।

'আমাদেরকে জানতে হবে বোমা দুটো কখন তোলা হবে জলপরীতে,' বলল রানা। 'কোথাও ফাটাতে হলে প্রথমে বোমাটাকে নিয়ে যেতে হবে সেখানে। সম্ভাব্য বাহন জলপরী ছাড়া আর কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ইয়টটায় বোমা আছে, এটা জানার পর যা কিছু করার সব করতে পারব আমরা। ভূপতির বিশ্বাস, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা আছে তার। এটাই আমাদের সম্বল। কী বলছি বুঝতে পারছ?'

'ইয়টে বোমাগুলো তোলা হলে তোমার জানার উপায় কী?'

'তুমি। তুমি বলবে আমাকে। বলবে কি?'

'বলব।' নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তৃষ্ণাকে। 'কিন্তু আমিই বা জানব কীভাবে? আর যদি জানতে পারিও, খবরটা তোমাকে দেব কীভাবে? ধনঞ্জয় ভূপতিকে তুমি বোকা মনে কোরো না। তার এক মাত্র বোকামি আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, তা হলো এত বড় একটা অপারেশনের মধ্যে নিজের রক্ষিতাকে কাছে রাখতে চাওয়াটা।'

'ভূপতি তোমাকে কখন জলপরীতে উঠতে বলেছে?'

'পাঁচটায়। একটা বোট নিতে আসবে আমাকে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'এখন বাজে চারটে। গাইগার কাউন্টার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আমি। খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। ইয়টে বোমা আছে কিনা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে তোমাকে। আমি চাই এটা তুমি জলপরীতে নিয়ে যাও। যদি জানতে পার বোমা আছে, পোর্টহোলে আলো দেখাবে। তোমার কেবিনের আলোটা বার কয়েক জ্বালবে আর নেভাবে, তা হলেই হবে। ইয়টের ওপর নজর রাখার জন্যে আমাদের লোক থাকবে। কাজ হয়ে গেলে গাইগার কাউন্টারটা ফেলে দিয়ো পানিতে।'

'এটাকে ছেলেমানুষি বলে, প্ল্যান নয়,' তিরস্কারের সুরে বলল তৃষ্ণা। 'রাত হলে জ্বালব, কিন্তু দিনের বেলা কেবিনের আলো জ্বালে কেউ? তারচেয়ে ডেকে বেরিয়ে আসব আমি, তোমাদের লোকজন যাতে দেখতে পায় আমাকে। আর ইয়টে যদি বোমা না থাকে, কেবিন ছেড়ে বেরুব না।'

'ঠিক আছে, তাই কোরো।'

'করব মানে, যদি ভূপতিকে খুন করার ঝোঁকটা দমিয়ে রাখতে পারি আর কী। তবে, সেক্ষেত্রে আমি চাই, কাজটা তুমি করবে। করবে তো?'

'কার হাতে কে মারা যাবে সেটা এখনই বলা খুব কঠিন, তৃষ্ণা,' বলল রানা। 'আমার কাজ, যদি সম্ভব হয়, ওদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া। বিচারে ফাঁসি হবে কিনা জানি না, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবেই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল তৃষ্ণা। 'ঠিক আছে, তাতেও আমি খুশি। এবার দেখিয়ে দাও কীভাবে মেশিনটা চালাতে হয়।' হঠাৎ ঘুরল সে, তারপর হাতের ব্রেসলেটটা ছুঁড়ে দিল সাগরের দিকে।

মেশিনটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে দেখিয়ে দিল রানা। রিস্টওয়াচ ইন্ডিকেটর বাদ, ক্লিক-ক্লিক আওয়াজটার উপর নির্ভর করতে হবে তৃষ্ণাকে। 'আন্দামান থেকে বিদায় নিচ্ছ, ছবি তোলার সেটাই কারণ, এটা বলতে পারবে তো?' জানতে চাইল ও।

'পারব,' বলল তৃষ্ণা, তারপর হঠাৎ রানার একটা হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'রাগের মাথায় বোকার মত কী বলেছি, ও-সব তুমি মনে রেখো না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি না।'

'সে আমি জানি, তৃষ্ণা।'

'এখন তা হলে কী হবে? আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন?'

এই প্রশ্নটাকেই ভয় পাচ্ছিল রানা। গাইগার কাউন্টার সহ ইয়টে পাঠিয়ে তৃষ্ণাকে বিরাট একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ও। ভূপতি বা তার কোনও লোকের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে সে। সেক্ষেত্রে তখনই খুন করা হবে তাকে। আর যদি শেষ পর্যন্ত ধাওয়া শুরু হয়, হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, গুলি

করে বা টর্পেডো ছুঁড়ে জলপরীকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে মাভৈ, সম্ভবত কোন ওয়ার্নিং না দিয়েই। এ-সব সমস্যা জানা আছে ওর, কিন্তু সমাধান জানা নেই। তৃষ্ণার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'অপারেশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, যেখানেই থাকো তুমি, তোমাকে আমি খুঁজে বের করব। তবে এই কাজটার মধ্যে মারাত্মক ঝুঁকি আছে, তৃষ্ণা। তুমিও জানো, যে-কোন বিপদ ঘটতে পারে। চিন্তা করে দেখো, কাজটা করবে কি না।'

জবাবে নিজের হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে তৃষ্ণা বলল, 'এখন আর এ প্রশ্ন করার কোন মানে হয় না। সাড়ে চারটে বাজে, এবার আমাকে যেতে হয়।' রানার সামনে চলে এল সে। 'আমার সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত যেয়ো না, এখানেই চুমো খাও।' হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সে। 'এসো।'

কয়েক মিনিট পর ফোক্সওয়াগেনের ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ শুনল রানা। গাড়িটাকে নিশ্চয়ই কোনও ঝোপের আড়ালে রেখেছিল তৃষ্ণা। ওটার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর নিজের ল্যান্ড রোভারের দিকে এগোল ও।

ফেরার পথে তীরের কাছাকাছি একটা পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরের পিছনে থামল রানা। এখান থেকে পুলিশের দু'জন লোক পালা করে নজর রাখছে জলপরীর উপর। তাদেরকে ব্রিফ করল ও, রেডিওতে পুলিশ কমিশনার খগেন মিত্রের সঙ্গে কিছু কথাও বলল।

অনিলের দুটো রিপোর্ট জানা গেল ভদ্রলোকের কাছ থেকে। একটা হলো, উইমবারলিগঞ্জের ভাড়া করা বাড়িটা সার্চ করে কিছু পাওয়া যায়নি, দারোয়ানের কাছ থেকে শুধু জানা গেছে তৃষ্ণার ব্যাগগুলো আজ বিকেলে তোলা হয়েছে জলপরীতে। বোটহাউসে সন্দেহজনক কিছু নেই। ওখানে একটা বোট আছে, তলাটা ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি। আর আছে বৈঠা সহ চাকা লাগানো একটা ডিঙ্গি। আকাশ থেকে দেখা ট্র্যাকগুলো ওই ডিঙ্গির তৈরি হতে পারে। দ্বিতীয় মেসেজে বলা হয়েছে, বিশ মিনিটের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বারো মাইল দক্ষিণে, রংচঙে পৌঁছাবে মাভৈ, ওখানে রানার জন্য অপেক্ষা করবে অনিল।

গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল রানা; আলিপুর, তোষণাবাদ, মিঠা খাঁড়ি, বিয়াদোনাবাদ হয়ে রংচঙে পৌঁছাতে হবে ওকে।

চোদ্দো

সাবমেরিন মাভৈ-এর ভিতরটা যথেষ্ট প্রশস্ত, নীচে নামার জন্য মইয়ের বদলে রয়েছে সিঁড়ি। একজন ওয়াচার ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা দরজার সামনে নিয়ে এল, কবাটের গায়ে লেখা রয়েছে–'কমান্ডার গুজরাল সিন্ধিয়া, ইন্ডিয়ান নেভি'।

চৌকো একটা কাঠামো, বয়স হবে চল্লিশের আশপাশে, চোখ দুটোয় একটু কৌতুকের ভাব থাকলেও, গোটা মুখমণ্ডলে কর্কশ নির্দয়তার ছাপ স্পষ্ট। চেয়ার ছাড়লেন, ডেস্কের উপর ঝুঁকে করমর্দন করলেন ওদের সঙ্গে, তারপর ওয়াচারের দিকে তাকালেন। 'কফি, প্লিজ, অক্ষয়। আর এটা পাঠিয়ে দাও।' সিগনাল প্যাড থেকে উপরের কাগজটা ছিঁড়ে বাড়িয়ে ধরলেন। 'এখনই।'

ওয়াচার অক্ষয় চলে যেতে বসলেন তিনি। 'স্বাগতম। মিস্টার মাসুদ রানা, একজন বাংলাদেশী অফিসারকে আমার সাবমেরিনে পেয়ে আমি গর্বিত। আগে কখনও সাবে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

'সামান্যই,' জবাব দিল রানা।

'তাই বা মন্দ কী,' বলে হেসে উঠলেন কমান্ডার সিন্ধিয়া। আর আপনি, মিস্টার অনিল চ্যাটার্জি?'

'না, কমান্ডার। তবে স্বপ্ন দেখি কম দামে পেয়ে গেলে কিনে ফেলব একটা।'

হেসে উঠলেন কমান্ডার। তারপর, হাসিটা থামতেই, কাজের কথায় চলে এলেন। 'বেশ। এবার অপারেশনটা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দিন আমাকে, প্লিজ।'

অনিল ব্রিফ করল তাঁকে। জলপরীর মালিক ধনঞ্জয় ভূপতিকে সন্দেহ করা হচ্ছে। হাইজ্যাক করা মিগটা কোথায় আছে জানা গেলেও, বোমা দুটো তাতে নেই। সর্বশেষ খবর, সি-প্লেন নিয়ে দুপুর দেড়টায় কোথাও গেছে ভূপতি। হয়তো বোমা দুটো কোনও দ্বীপে লুকিয়ে রেখেছে, সেগুলো আনতে গেছে। তৃষ্ণা কান্তাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা-ও তাঁকে জানানো হলো।

দশ মিনিট পর চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপ ধরালেন কমান্ডার গুজরাল সিন্ধিয়া। 'আপনারা তা হলে ধারণা করছেন, সি-প্লেনে করে বোমা দুটো নিয়ে আসবে সে। যদি আনে, মেয়েটি তা জানতে পারবে। তার সংকেত পেয়ে

জলপরীর দিকে এগোব আমরা, নাগালের মধ্যে এলে টর্পেডো ছুঁড়ে ডুবিয়ে দেব ওটাকে? এই তো?'

'ঠিক তা নয়,' শান্তভাবে বলল রানা। 'সাঙ্গপাঙ্গ সহ লোকটাকে গ্রেফতার করতে চাই আমরা, উদ্ধার করতে চাই বোমা দুটোও। তবে সবই নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। ভূপতি দুটো স্পিড বোট ব্যবহার করতে পারে; একটা চেন্নাই শহরের, অপরটা চিনের বড় কোনও শহরের কাছাকাছি কোথাও বোমা রেখে আসবে। সেরকম কিছু ঘটছে দেখলে জলপরীকে নয়, ধাওয়া করে ওই স্পিড বোট দুটোকে ডুবিয়ে দিতে হবে।'

'কিন্তু মাভে একই সময়ে দুটোর পেছনে ছুটবে কীভাবে?'

'জানি তা সম্ভব নয়, তাই জেনারেল জনার্দন ত্রিপুরারিকে প্রস্তুত থাকতে বলেছি, আমরা বললেই যাতে মিসাইল ঘাঁটি থেকে এক স্কোয়াড্রন ফাইটার প্লেন আকাশে তুলতে পারেন।'

'ভেরি গুড।'

'এবার আপনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বলুন, কমান্ডার,' প্রশ্ন করল রানা। 'কতক্ষণে রওনা হতে পারবেন?'

'বলা মাত্র, মিস্টার রানা—পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'এখন আমরা পুলিশ হেডকোয়ার্টারের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করব।'

আরও আধ ঘণ্টা পরে রেডিও রুম থেকে একটা মেসেজ পেলেন কমান্ডার সিন্ধিয়া। পুলিশ কমিশনার খগেন মিত্র পাঠিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে—'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সি-প্লেনটা ফিরে এসেছে জলপরীতে। পৌনে আটটায় ফুল স্পিডে রওনা হয়ে গেছে জলপরী, যাচ্ছে পুবদিকে। মেয়েটি ডেকে বেরোয়নি—আবার বলছি—মেয়েটি ডেকে বেরোয়নি।'

কমান্ডারের কাছ থেকে সিগনাল প্যাড চেয়ে নিয়ে খসখস করে তিনটে মেসেজ লিখল রানা। প্রথমটা চিনা ইন্টেলিজেন্সে বন্ধুবর ফু-চুঙকে পাঠাবে। লিখল—'উপকূলে পাহারা জোরদার করো। অচেনা স্পিড বোট, ইয়ট বা সি-প্লেন দেখলেই চ্যালেঞ্জ করো। ধনঞ্জয় ভূপতি অন্তত একটি বোমা ওদিকে পাঠাতে পারে বলে সন্দেহ করছি।'

দ্বিতীয় মেসেজটা পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছে, অনিলের তরফ থেকে। এটাতেও সেই একই পরামর্শ থাকছে—সতর্ক থাকুন। তৃতীয়টা পাঠানো হবে ডিফেন্স আইল্যান্ডের মিসাইল ঘাঁটির কমান্ডার জেনারেল জনার্দন ত্রিপুরারির কাছে।

রেডিও রুমের মেসেঞ্জার কাগজগুলো নিয়ে চলে যেতেই কমান্ডার সিন্ধিয়া

সাবমেরিন স্টার্ট দিতে বললেন। খানিক পরেই সারফেসে উঠে এল মাভৈ, দশ নট গতিতে ছুটল উত্তর-পুবদিকে। কয়েকটা ডুবো পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে আসার পর স্পিড বাড়িয়ে ত্রিশ নটে তোলা হলো। রানা আর অনিলের ধারণা, জলপরীর বর্তমান গন্তব্য যদি নরকোন্দম দ্বীপ হয়, আশা করা যায় ওটাকে মাঝপথে বাধা দিতে পারবে মাভৈ।

কিন্তু জলপরী পূর্ণগতিতে ছুটবে কেন, যদি না ওটায় অন্তত একটা বোমা থাকে? আর বোমা থাকলে সংকেত দেয়নি কেন তৃষ্ণা? তবে কি তার কোন বিপদ হয়েছে?

নীল আয়নার মত সাগরের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে জলপরী। ইঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ ছাড়া বড়সড় স্টেটরুমটা নীরব হয়ে আছে। সাবধানতার মার নেই ভেবে প্রতিটি পোর্ট হোলের স্টর্ম শাটার বন্ধ করে দেওয়া হলেও, আলো আসছে শুধুমাত্র ছাদে আটকানো নেভিগেশন লণ্ঠন থেকে। নিস্তেজ লালচে আলোয় লম্বা টেবিলের চারধারে বসা বিশজন লোকের মুখই শুধু কোন রকমে দেখা যাচ্ছে, তাদের ছায়াগুলো দেখতে হয়েছে দৈত্যাকার আর ভৌতিক।

টেবিলের মাথায় বসেছে ধনঞ্জয় ভূপতি। কামরাটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলেও ঘামে চকচক করছে তার মুখ। কথা বলছে চাপা উত্তেজিত সুরে। 'পরিস্থিতি এত খারাপ যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছি আমি। আধ ঘণ্টা আগে মিস তৃষ্ণাকে একটা ক্যামেরা নাড়াচাড়া করতে দেখতে পান বারো নম্বর। তৃষ্ণা তাঁকে দেখতে পেয়ে ক্যামেরাটা তুলে সাগরের ফটো তোলার ভান করে, যদিও লেন্সের ওপর সেফটি ক্যাপটা লাগানোই ছিল। স্বভাবতই সন্দেহ হয় বারো নম্বরের। আমাকে রিপোর্ট করেন তিনি।'

'নীচে গিয়ে তৃষ্ণাকে তার কেবিনে নিয়ে যাই আমি। আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল সে। তার আচরণ আমাকে সন্দিহান করে তোলে। তাকে শান্ত করার জন্যে অপ্রীতিকর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হই আমি। তারপর ক্যামেরাটা পরীক্ষা করি।'

থামল ভূপতি; দম নিয়ে আবার শুরু করল। 'ক্যামেরাটা নকল, ওটার ভিতরে একটা গাইগার কাউন্টার লুকানো ছিল। আমি তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে জেরা করি, কিন্তু উত্তর দিতে অস্বীকার করে সে। সময়মত ঠিকই আমি তার মুখ খোলাব, তারপর তাকে মেরে ফেলা হবে। ঠিক তখন সময় ছিল না, কারণ আমরা রওনা হতে যাচ্ছিলাম। আমি আবার তাকে অজ্ঞান করেছি, তারপর রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এসেছি তার বাঙ্কে। এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে ব্যাপারটা সবাইকে জানাবার জন্যে।'

চোদ্দো নম্বর, একজন সিঙ্গাপুরিয়ান চিনা, কর্কশ সুরে প্রশ্ন করল, 'এখন কী হবে, মিস্টার এক্স?'

'যা ঘটেছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই,' বলল ভূপতি। 'সারা দুনিয়ার গাইগার কাউন্টার বোমা দুটোকে খুঁজছে। হয়তো পোর্ট ব্লেয়ারের কোনও উৎসাহী পুলিশ হারবারের সবগুলো জাহাজের রেডিয়েশন চেক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়তো ঘুষ দিয়ে মিস তৃষ্ণাকে ক্যামেরাটা গছিয়ে দেয় সে। যাই হোক, আমি মনে করি অস্ত্রটা টার্গেট এরিয়ায় একবার বসাতে পারলে আর কোনও ভয় নেই। আমার নির্দেশে রেডিও অপারেটর কান পেতে আছে, কিন্তু দিল্লি বা বেইজিং থেকে পোর্ট ব্লেয়ার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে কোনও মেসেজই আসছে না। তারমানে, এখনও আমাদেরকে সন্দেহ করা হচ্ছে না। কাজেই যেমন প্ল্যান করা হয়েছে সেভাবেই শেষ করব অপারেশন। আরও কিছু দূর যাবার পর অস্ত্রটার লেডকেসিং ফেলে দেব আমরা। ওই কেসিঙের ভেতরে ভরে দেব তৃষ্ণাকে।'

চোদ্দো নম্বর আবার মুখ খুলল। 'তবে তার আগে আপনি মেয়েটিকে মুখ খুলতে বাধ্য করবেন? আমাদেরকে সন্দেহ করা হচ্ছে, এই চিন্তা ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার জন্যে বিরাট বাধা।'

'ইন্টারোগেশন শুরু হবে এই মিটিং শেষ হলেই। আমার মতামত জানতে চাইলে বলব, কাল যে দু'জন লোক ইয়টে এসেছিল—সাপুড়ে আর পটনায়েক—এরা দুজনই এর সঙ্গে জড়িত। তারা সিক্রেট এজেন্ট হতে পারে। পটনায়েকের কাছে একটা ক্যামেরা ছিল। তৃষ্ণার কাছে যেটা পাওয়া গেছে প্রায় সেটার মতই দেখতে। লোক দুটোর ব্যাপারে আরও সতর্ক না হবার জন্যে নিজেকেই দায়ী করছি আমি। তবে তাদের গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল।

'যাই হোক, কাল সকালে পোর্ট ব্লেয়ারে ফেরার সময় সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে। বলা হবে মিস তৃষ্ণা ইয়ট থেকে পানিতে পড়ে গেছে। গল্পটা কী হবে, বানিয়ে রাখব আমি। তদন্ত তো একটা হবেই। আমাদের সাক্ষীদের টলানো যাবে না। বুদ্ধিমানের কাজ হবে মুদ্রাগুলোকে অতিরিক্ত অ্যালিবাই হিসেবে কাজে লাগানো। পাঁচ নম্বর, ওগুলোর ক্ষয় সন্তোষজনক তো?'

পাঁচ নম্বর, ফিজিসিস্ট কুমারেশ লাহিড়ী, হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি কিন্তু নয়। খালি চোখে, কিংবা তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষা করলে সমস্যা হবে না। সতেরো শতাব্দীর চিনা মুদ্রা ওগুলো। আসলে সোনা আর রুপোর ওপর লবণাক্ত পানির খুব একটা প্রভাব নেই। আমি সামান্য অ্যাসিড ব্যবহার করেছি, ফলে কর্কশ লাগবে আঙুলে।'

'পানির গভীরতা সম্পর্কে কী বলবে সাক্ষীরা?'

'দশ ফ্যাদম। নরকোন্দমের কাছে একটা ডুবো পাহাড় আছে, ওখানে ফেলা হয়েছে কয়েনগুলো, সার্চ করলে পুলিশ যাতে সহজেই খুঁজে পায়। আরেকটা কথা–'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'ডুবো পাহাড়টার পরেই সাগরের গভীরতা দুশো ফ্যাদম,' বলল লাহিড়ী। 'বলা হবে অ্যাকুয়ালাঙ নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন মিস তৃষ্ণা, আমরা সবাই তাঁকে তলিয়ে যেতে দেখেছি। তার আগে এ-ও বলতে হবে যে তাঁকে আপনি সাগরে নামতে মানা করেছিলেন, কিন্তু আপনার কথা তিনি শোনেননি।'

'গুড আইডিয়া,' প্রশংসা করল ভূপতি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার লাহিড়ী। 'এ-ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট তো হর-হামেশা ঘটছেই। তবে অ্যাক্সিডেন্টটা অন্য জায়গায় ঘটাতে হবে।'

'সেটা আপনার ইচ্ছে।'

'বেশ, এবার তা হলে ফাইনাল ডিটেইলস্ আরেকবার স্মরণ করা যাক।' হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল ভূপতি। 'এখন মাঝরাত। তিনটের দিকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। আর ভোরের আলো ফুটবে পাঁচটার কিছু পরে। কাজেই অপারেশনের জন্য দু'ঘণ্টা সময় পাব আমরা।

'ইতিমধ্যে কোর্স বদলানো হয়ে গেছে, নরকোন্দমে যাচ্ছি না আমরা। কোকো চ্যানেলকে আড়াআড়ি ভাবে পার হচ্ছি, বাঁক নিয়ে সারি-সারি দ্বীপগুলোকে পাশ কাটাব, এভাবে পৌঁছে যাব ডিফেন্স আইল্যান্ডের এক মাইলের মধ্যে।

'ওদিকের পানিতে জেলেদের ইঞ্জিন নৌকাগুলো সারারাত মাছ ধরে, কাজেই মিসাইল ঘাঁটির রাডার জলপরীকে আলাদাভাবে চিনতে পারবে না। আমরা ঠিক রাত তিনটের সময় নোঙর ফেলব। তারপর সুইমিং পার্টি রওনা হবে, আরও আধ মাইল এগিয়ে লেইং পয়েন্টে বোমাটা রেখে আসার জন্যে।

'সুইমিং পার্টিতে পনেরজন থাকবে। একটা তীরচিহ্নের আকৃতি নিয়ে সাঁতার কাটবেন আপনারা। মাঝখানে থাকবে টু-সিটার সাবমেরিন। ওটার পিছনে থাকবে আন্ডারওয়াটার স্লেজ, মিসাইল সহ। ঝাঁকটা ঠিক রাখতে হবে, তা নয় হলে টেরও পাবেন না কে কোন্ দিকে চলে গেছেন। একজনের পিঠের টর্চ থেকে নীল আলো বেরুবে, সারাক্ষণ একটা চোখ রাখবেন ওটার ওপর। তারপরও কেউ যদি হারিয়ে যান, ইয়টে ফিরে আসবেন। ব্যাপারটা পরিষ্কার?'

টেবিলে বসা লোকগুলো যন্ত্রচালিত পুতুলের মত একযোগে মাথা ঝাঁকাল।

'এসকর্টের প্রথম কাজ হবে হাঙর আর ব্যারাকুডা আসছে কিনা খেয়াল রাখা। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের হারপুন গানের রেঞ্জ বিশ ফুটের

বেশি নয়, আর আঘাত করতে হবে মাছের মাথায়। যিনি ফায়ার করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই তিনি তাঁর পাশেরজনকে জানাবেন, যাতে প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ফায়ার করার জন্যে তৈরি থাকতে পারেন তিনি।

'পানির তলার পরিবেশ আমাদের অচেনা, ওখানে আমরা অভ্যস্তও নই। সাঁতারুদের একটা করে পিল দেয়া হবে, এক্সট্রা স্ট্যামিনা আর উৎসাহ বোধ করার জন্যে। ব্যস, এটুকুই। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

মূল প্ল্যানটা করার সময়, বেশ কিছু দিন আগে, ধনঞ্জয় ভূপতির সন্দেহ হয়েছিল 'বাসযোগ্য পৃথিবী চাই'-এর কোন সদস্য যদি ঝামেলা পাকায়, সে হবে থাইল্যান্ডের থোনফালান কুম্ভকর্ণ, কারণ তার রেকর্ড খুব খারাপ, লাভের টাকা না দেওয়ার মতলবে ব্যবসায়িক পার্টনারদের মেরে ফেলে সে।

দেখা গেল আট নম্বর, অর্থাৎ থোনফালানই হাত তুলেছে।

'হ্যাঁ, বলুন,' অনুমতি দিল ভূপতি।

'প্রথমেই আপনার প্রশংসা করি, মিস্টার এক্স, কারণ প্ল্যানটা সত্যি খুব ভাল—সামান্য একটা ত্রুটি ছাড়া।'

'ত্রুটি? কী ত্রুটি?'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, মিস্টার এক্স,' বলল থাই মাফিয়া বস্ থোনফালান কুম্ভকর্ণ। 'এক নম্বর বোমাটা সত্যি যদি আমাদেরকে ফাটাতে হয়, আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বলে কিছু থাকবে না মানচিত্রে। তিন লাখ মানুষকে নিয়ে ছয় হাজার চারশো পঁচাত্তর বর্গ কিলোমিটার জমিন স্রেফ অদৃশ্য হয়ে যাবে...'

'বক্তব্য সংক্ষেপ করুন,' তাকে থামিয়ে দিয়ে ভারী গলায় বলল ভূপতি। 'সোনা পেলে বোমাটা আমরা ফাটাব না।'

'জী, সংক্ষেপেই সারি তা হলে,' বলল থোনফালান। 'আমরা পনেরোজন টার্গেট এরিয়ায় বোমাটা রেখে আসতে যাব, তাই না? আচ্ছা ধরুন যদি এমন হয়—বোমা তো জায়গা মত রাখলাম, কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম ইয়ট নেই, আমাদের জন্যে অপেক্ষা না করেই ফিরে গেছে, তখন কী হবে?'

'আপনার কেন মনে হচ্ছে, আপনাদেরকে না নিয়েই ফিরে যাবে ইয়ট?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল ভূপতি।

'দেখুন, মিস্টার এক্স, দুশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার খেলা কথা নয়, বি-রা-ট বড় অ্যামাউন্ট,' বলল কুম্ভকর্ণ। 'আর মাত্র সতেরো ঘণ্টার মধ্যে সময়সীমা শেষ হতে যাচ্ছে। তারপরই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, তারপর পুরস্কারটা আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। ঠিক এই সময় আমার মাথায় একটা অশুভ চিন্তা জেগেছে।'

'কী চিন্তা?' কোটের পকেটে হাত ভরে ছোট্ট কোল্ট .২৫-এর সেফটি ক্যাচ

প্রশ্ন করল ভূপতি।

'একটা সন্দেহ, মিস্টার এক্স। এই সন্দেহের কথা সবাইকে আমি জানাতে চাই, বিশেষ করে সুইমিং পার্টিতে যাঁরা থাকবেন।'

'আপনি অযথা বেশি সময় নিচ্ছেন,' আশ্চর্য ঠান্ডা শোনাল ভূপতির কণ্ঠস্বর। সে লক্ষ করল, টেবিলের পরিবেশ নীরব আর আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

'আমরা পনেরোজন পার্টনার পানিতে থাকব। বাকি পাঁচজন আপনারা ইয়টে থাকবেন। এখন আমরা পনেরোজন যদি ইয়টে আর ফিরতে না পারি, সোনার ভাগটা শুধু আপনারা পাবেন। এরকম পরিস্থিতিতে, আমি যদি ইয়টে থাকি, আমার মাথায় এই কুবুদ্ধিটা আসবে–ইয়ট নিয়ে সরে যাই, ওই পনেরোজন ডুবে মরুক, আমরা ক'জন ভাগে বেশি করে সোনা পাই। যে কুবুদ্ধি আমার মাথায় আসবে, সেটা আপনাদের কারও মাথায় আসবে না কেন?'

কয়েক সেকেন্ড কেউ নড়ল না। কারও মুখে কোনও শব্দ নেই। তারপর শান্ত স্বরে ভূপতি বলল, 'এটাকে আপনার যদি একটা সমস্যা বলে মনে হয়, আপনি কি এর কোনও সমাধানের কথাও ভেবেছেন?'

একটু হাসল থোনফালান কুম্ভকর্ণ। 'সমাধান একটাই। আপনিও আমাদের পনেরো জনের সঙ্গে থাকবেন।'

'আচ্ছা! আপনার তা হলে আমাকে সন্দেহ। কিন্তু পিঠে টর্চ নিয়ে আমিই তো আপনাদের সবার আগে পানিতে থাকব।'

'মানে!' শিউরে উঠল থোনফালান কুম্ভকর্ণ। 'কিন্তু তা তো আপনি একবারও বলেননি!'

'সময়ের আগে সব কথা বলতে হবে কেন?' প্রশ্ন করল ভূপতি।

'তা হলে আমি দুঃখিত,' প্রাণভয়ে সম্মান খোয়াতে বাধছে না কুম্ভকর্ণর। 'আমি না জেনে একটা ভুল করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হোক।'

ভূপতি হাসল। 'কিন্তু সবার মনে আপনি যে কুবুদ্ধি ঢুকিয়ে দিলেন, তার কী হবে, মিস্টার থোনফালান কুম্ভকর্ণ? আমরা পানিতে নামলাম, কাজ সেরে ফিরে এসে যদি দেখি সত্যিই ইয়ট নেই, তখন কী করব?'

'তখন আমার অ্যাকুয়ালাঙ খুলে নিয়ে পানিতেই মেরে ফেলবেন আমাকে।' বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে কুম্ভকর্ণ।

'তাতে লাভ কী? ইয়টে উঠতে না পারলে আমরাও তো মারা যাচ্ছি–অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলেই।'

'সেক্ষেত্রে ইয়টে আমাকে রেখে যান,' মরিয়া হয়ে আরেকটা প্রস্তাব দিল কুম্ভকর্ণ। 'আমি সবার ওপর নজর রাখব...'

টেবিলের সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

'আগেই বলেছি, সময়ের আগে কাউকে কিছু বলি না আমি। এ-ও বলেছি, পালিয়ে আমার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া আপনাদের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ইয়ট নিয়ে কেউ যাতে পালাতে না পারে তার ব্যবস্থা আমার করাই আছে।' একটু বিরতি নিল ভূপতি। 'কিন্তু সেটা কী, এখনই কাউকে আমি বলছি না।'

কামরার ভিতর পিন-পতন নীরবতা।

'আপনি, মিস্টার কুম্ভকর্ণ, আমার সঙ্গে মস্ত একটা বেয়াদবি করলেন। তবে যেহেতু ক্ষমা চেয়েছেন, এবারের মত আপনাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু...'

একে একে টেবিলে উপস্থিত সবার দিকে তাকাল ভূপতি। 'কিন্তু জানা দরকার, আমার বাকি পার্টনাররা কে কী ভাবছেন। তাঁদের মাথায় যদি এরকম একটা কুবুদ্ধি আসে যে আপনি না থাকলে আপনার ভাগের সোনাটা তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবেন?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল থোনফালান কুম্ভকর্ণ। 'আপনাদের সবার কাছে আমি করজোড়ে ক্ষমা চাইছি।'

টেবিলে বসা প্রত্যেকে যেন একেকটা পাথরের মূর্তি। তারা কেউ নড়ল না, কোনও শব্দ করল না, এমনকী চোখ তুলে একবার কুম্ভকর্ণর দিকে তাকালও না।

'আপনি উৎকট একটা সমস্যা তৈরি করেছেন, মিস্টার কুম্ভকর্ণ,' নীরবতা ভেঙে বলল ভূপতি, শান্ত কণ্ঠস্বরে আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই। 'তবে আমার কাছে এই সমস্যার খুব সহজ আর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটা সমাধান আছে।' পিস্তল ধরা লোমশ ডান হাতটা কোটের পকেট থেকে বের করে আনল সে।

ঢিল পড়ল কুম্ভকর্ণর পেশিতে। অমোঘ নিয়তিকে মেনে নিল সে। করুণ চোখে নিজের মৃত্যুকে দেখছে পিস্তলটার অন্ধকার মাজলের ভিতর।

তিনটে বুলেট এত দ্রুত আঘাত করল থাই মাফিয়া বসের নাকে-মুখে-চোখে, যেন একটাই বিস্ফোরণের আওয়াজ হয়েছে, আলোর উজ্জ্বল ঝলকও একটাই দেখা গেছে। কুম্ভকর্ণর নিস্তেজ হাত দুটো উপরে উঠল, তালুগুলো সামনে, যেন পরবর্তী বুলেটগুলো ঠেকাতে চায়। একটা ঝাঁকি খেল শরীরটা, টেবিলের কিনারায় পেট ঠেকল, পরমুহূর্তে চেয়ারটাকে নিয়ে ছিটকে পড়ল পিছনদিকের মেঝেতে।

পিস্তলের মাজল নাকের সামনে তুলল ভূপতি, সাবধানে গন্ধ শুঁকল—নাকের নীচে আগুপিছু করছে ওটাকে, যেন প্রিয় কোন সেন্টের শিশি। কিছু বলছে না, চোখ তুলে একে একে তাকাল সবার দিকে। তারপর মুখ খুলল। 'মিটিং এখানেই শেষ হলো। আপনারা সবাই যে যার কেবিনে ফিরে গিয়ে শেষবারের মত ইকুইপমেন্টগুলো চেক করে নিন, প্লিজ। গ্যালিতে ইতিমধ্যে খাবার তৈরি হয়ে গেছে। যাঁরা চান, এক আউন্স করে অ্যালকোহল পাবেন। দুজন ক্রুকে

পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি, মিস্টার কুম্ভকর্ণকে সরিয়ে নিয়ে যাবে তারা। ধন্যবাদ সবাইকে।'

সবাই বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর চেয়ার ছাড়ল ভূপতি, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর লম্বা একটা হাই তুলল। সাইডবোর্ডের দিকে ঘুরল সে, দেরাজ খুলে হাভানা চুরুটের একটা বাক্স বের করল। দেখেশুনে একটা চুরুট নিল ভূপতি। চোখে-মুখে বিষাদের একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে ধরাল সেটা। তারপর আইস কিউব ভর্তি লাল রাবার কন্টেইনারটা নিয়ে বেরিয়ে এল প্যাসেজে, এবার তৃষ্ণা কান্তার কেবিনের দিকে যাচ্ছে।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল ভূপতি। এখানেও সিলিং থেকে লাল একটা ইলেকট্রিক লণ্ঠন জ্বলছে। আলোটার নীচে ডাবল বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে তৃষ্ণা, হাতের কবজি আর পায়ের গোড়ালিতে স্ট্র্যাপ জড়ানো হয়েছে, বাঙ্কের চারকোণের চারটে লোহার স্ট্যান্ড-এর সঙ্গে প্রান্তগুলো আটকানো।

চেস্ট অভ ড্রয়ারের মাথায় আইসবক্সটা রাখল ভূপতি, সেটার পাশে সাবধানে শোয়াল চুরুটটাকে, জ্বলন্ত মাথা যাতে চকচকে পালিশ নষ্ট না করে।

তাকে দেখছে মেয়েটি, চোখ দুটো আধো অন্ধকারে একজোড়া লাল ফোঁটা।

ভূপতি বলল, 'দেখো, তৃষ্ণা, তোমার শরীর আমাকে অপার আনন্দ দিয়েছে। পরিবর্তে আমিও তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি, তোমার বহু শখ-সাধ মিটিয়েছি। অথচ তবুও কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে চলে গেলে, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'বাস্টার্ড!' হঠাৎ হিসহিস করে উঠল তৃষ্ণা। 'তুমি একটা বেজন্মা কুত্তা!'

শ্রাগ করল ভূপতি। 'এইমাত্র আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম, কাজেই এখন আর জানতে চাই না কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে চলে গেছ। এখন শুধু জানতে চাই মেসিনটা কে তোমাকে দিয়েছে।'

মুখ বাঁকাল তৃষ্ণা। 'তার নাম না বললে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে, এই তো? মারো!'

'মারব না, তোমাকে ব্যথা দেব,' বলল ভূপতি, যেন তৃষ্ণার কথা তার কানে যায়নি। 'এই অতি সাধারণ দুটো ইন্সট্রুমেন্টের সাহায্যে।' চুরুটটা নিয়ে জ্বলন্ত মাথায় ফুঁ দিল সে, যতক্ষণ না টকটকে লাল হলো আগুনটা। 'এই চুরুট ছ্যাঁকা দেয়ার জন্যে, আর ওই বরফ ঠাণ্ডা করার জন্যে। সায়েন্টিফিকালি ব্যবহার করতে পারলে, তোমার চিৎকার থামার পর মুখ খুলবে তুমি, আর তখন সত্যি কথাও বলবে। এবার বলো, স্বেচ্ছায় সব বলবে, নাকি আমি তোমাকে দিয়ে বলাব?' চুরুটটা আগের জায়গায় রেখে দিল সে। হাসল।

'আমার ভাইকে তুমি খুন করেছ। এখন আমাকে করবে। বেশ, যত পার মজা করে নাও। তবে জেনো, মৃত্যুর কালো ছায়া তোমার ওপরও পড়েছে। আর বেশি দেরি নেই, ব্যাপারটা শুরু হতে যাচ্ছে। ভগবানকে বলি, তখন যেন তোমাকে আমাদের দুজনের চেয়ে এক কোটি গুণ বেশি ভুগতে হয়।'

ভূপতির হাসিটা এত কর্কশ, যেন একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। 'তা হলে আস্তে-ধীরে শুরু করি, কেমন? খু-উ-ব আস্তে, হ্যাঁ?'

ঝুঁকল ভূপতি, তৃষ্ণার ম্যাক্সির নেকলাইন আর ব্রেসিয়ারের জয়েন-এ দুই হাতের আঙুলগুলো আটকাল। ধীরে ধীরে, তবে প্রচণ্ড শক্তিতে, ছিঁড়ে ফেলল ওগুলো। ছেঁড়া অংশ দুটো ছেড়ে দিতেই তৃষ্ণার শরীরটা অনাবৃত হয়ে পড়ল। পরিচিত শরীর, তারপরও খুঁটিয়ে দেখছে সে। যেন খুব দুঃখ হচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়ল বারকয়েক। একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসও ফেলল। তারপর চেস্ট অভ ড্রয়ারের মাথা থেকে চুরুট আর আইস বক্স নিয়ে বাঙ্কের কিনারায় বসল।

হাসছে ভূপতি। 'নারীদেহ নিয়ে কত রকমের খেলাই না খেলা যায়। খুব ভয়ঙ্কর টাইপের এক ধর্ষককে আমি চিনি, কোনও মেয়ে যদি খুব বেশি বাধা দেয় বা ধস্তাধস্তি করে, তাকে নিয়ে সে কী করে শুনবে? কাজ হয়ে যাবার পর তাকে কাটে সে। কাটে মানে বোঝো? টুকরো টুকরো করে। তারপর মাঠে-ঘাটে, ফুটপাথে-ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসে টুকরোগুলো। দূরে দাঁড়িয়ে আবার দেখে কুকুরের দল কেমন কাড়াকাড়ি করছে...'

'ওই লোকটা নিশ্চয় তুমি!' ঘৃণায়, অসহায় রাগে দাঁতে দাঁত চাপল তৃষ্ণা।

'ঠিক ধরেছ!' বলে চুরুটে কষে একটা টান দিয়ে তার অনাবৃত স্তনের দিকে ঝুঁকল ভূপতি।

পনেরো

মাভৈ-এর অ্যাটাক সেন্টারে সবাই খুব চুপচাপ। ইকো-সাউন্ডারের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কমান্ডার গুজরাল সিঙ্ঘিয়া, একা শুধু তিনিই মাঝে মধ্যে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে রানা আর অনিলের উদ্দেশে দু'-একটা মন্তব্য করছেন।

ডেপথ্ আর স্পিড গজ থেকে যথেষ্ট দূরে এক জোড়া চেয়ার দেয়া হয়েছে রানা আর অনিলকে। গজগুলোয় হুড পরানো, ফলে শুধুমাত্র নেভিগেশন টিমের

সদস্যরা পড়তে পারবে গুগুলো।

টিমের তিনজন সদস্য লাল লেদার মোড়া চেয়ারে পাশাপাশি বসেছে, অপারেট করছে রাডার ও সামনে-পিছনের ডাইভিং প্লেইন।

ইকো-সাউন্ডার রেখে রানা আর অনিলের কাছে চলে এলেন কমান্ডার সিন্ধিয়া। ভদ্রলোকের মুখে গম্ভীর হাসি লেগে আছে। হাত ঘড়ির উপর চোখ বুলালেন তিনি। 'রাত বারোটা। নরকোন্দমে আমরা কিছুই দেখলাম না। এখন কী, মিস্টার রানা?'

'সাবমেরিন ঘুরিয়ে নিন,' বলল রানা। 'কোকো চ্যানেল হয়ে দক্ষিণে যেতে চাই, পোর্ট ব্লেয়ারের পশ্চিমে।'

'ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ?' বললেন সিন্ধিয়া। 'আমি যতটুকু জানি হুমকি দেয়া হয়েছে বোমা ফাটানো হবে মেইনল্যান্ডের কোথাও।'

'হ্যাঁ, সেরকম হুমকিই দেয়া হয়েছে,' বলল রানা। 'কিন্তু ক্রিমিনালদের সব কথা কি বিশ্বাস করা উচিত?' ঘাড় ফেরাল ও। 'অনিল।'

অনিল বলল, 'কমান্ডার, দশ মিনিট আগে রেডিও রুম থেকে মেসেজ পেয়েছি আমরা। আমাদের মেইনল্যান্ড উপকূলে কোস্ট গার্ড আর নেভি চিরুনি অভিযান শুরু করেছে। ওরা জানিয়েছে, দুশো মাইলের মধ্যে প্রতিটি জলযানকে থামিয়ে সার্চ করা হচ্ছে।'

অনিল থামতেই রানা বলল, 'বেইজিং থেকেও এই একই মেসেজ এসেছে।'

'তার মানে, ধনঞ্জয় ভূপতি আর তার দল বোমাটা ফাটাবে ডিফেন্স আইল্যান্ডের কাছাকাছি কোথাও,' বলল অনিল। 'তার দেয়া সময় সীমা পার হতে বাকি আর মাত্র সতেরো ঘণ্টা। বোমাটা অ্যাকটিভেট করার পর, রেডিয়েশন থেকে বাঁচতে হলে জলপরী নিয়ে অন্তত দুশো মাইল দূরে পালাতে হবে তাকে। কাজেই সময়ের হিসেবটাই আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে ডিফেন্স আইল্যান্ডের মিসাইল ঘাঁটি ছাড়া তার নাগালের মধ্যে আর কোন টার্গেট নেই।'

যুক্তিটা বুঝতে পেরে আর কোন তর্কের মধ্যে গেলেন না কমান্ডার সিন্ধিয়া। ইন্টারকমের রিসিভার তুলে সাবমেরিন ঘুরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। 'ডিফেন্স আইল্যান্ডের কাছে পৌঁছাতে চার ঘণ্টার মত লাগবে আমাদের, অর্থাৎ ভোরের আলো ফুটতে তখন বাকি থাকবে এক ঘণ্টার মত। ততক্ষণ সারফেসেই থাকি আমরা।'

'ধন্যবাদ, কমান্ডার,' বলল রানা।

'জলপরীকে রেইডারের স্ক্রিনে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডুব দেব আমরা,' বললেন কমান্ডার। 'তখন বেল বাজবে। কাজেই এখানে শুধু শুধু বসে না থেকে যে যার বাঙ্কে শুয়ে একটু ঝিমিয়ে নিতে পারেন। তবে তার আগে মুখেও

বোধহয় কিছু দেয়া দরকার। আসুন, আপনাদেরকে আমি মেস হলে নিয়ে যাই।'

মেস হলে বসে ডিম পোচ, বাটার-টোস্ট আর কফির অর্ডার দিল রানা; তবে খিদে না থাকায় কফি ছাড়া আর কিছু খেতে পারল না। মন আর মাথা উত্তেজিত হয়ে আছে ওর। অ্যাকশন দরকার। সেটা শুরু হবে শুধু যদি রেইডারে জলপরী ধরা পড়ে।

উত্তেজনার সঙ্গে উদ্বেগও কম ভোগাচ্ছে না। মেয়েটিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে ও। তৃষ্ণার কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না রানা।

আবার সংশয়ও আছে। এতটা কি বিশ্বাস করা উচিত হয়েছে তৃষ্ণাকে? ওর সঙ্গে বেঈমানী করল না তো?

নাকি ভূপতির হাতে ধরা পড়ে গেছে?

বেঁচে আছে তো?

আরেক কাপ কফি খেলো রানা, কমান্ডার আর অনিলের আলোচনায় যোগ দিচ্ছে না। মনটাকে শান্ত করার জন্য চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলো, আসলে কল্পনায় নিজেকে ভূপতি মনে করছে, বুঝতে চাইছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার জায়গায় ও হলে কী করত।

দশ মিনিট পর চোখ খুলল রানা। 'অনিল?'

খাওয়ার ফাঁকে কমান্ডারের সঙ্গে আলাপ করছিল, ডাক শুনে ওর দিকে ফিরল অনিল। 'আমরা ভাবলাম ঘুমাবার চেষ্টা করছ তুমি।'

'কোনও প্ল্যান তৈরি করেছ?' সরাসরি জানতে চাইল রানা।

'মানে?' হেসে ফেলল অনিল। 'আমি তো জানি সেটা তোমার দায়িত্ব। আফটার অল তুমি আমার সিনিয়র—বয়সে যদি না-ও হও, অভিজ্ঞতায় তো অবশ্যই।'

'এসো, একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করি, ভোর চারটের সময় কী দেখতে পাব আমরা। তার আগে ধরে নিই কোকো চ্যানেল ঘুরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে জলপরী। চার্টটা খুব ভালভাবে দেখেছি আমি। ডিফেন্স আইল্যান্ডের উত্তরে বেশ কয়েকটা খুদে দ্বীপ আছে। ওগুলোর আড়াল নিয়ে এগোবে ভূপতি। টার্গেটের যথাসম্ভব কাছাকাছি বোমাটা ফাটাতে চাইবে সে। আমার ধারণা ডিফেন্স আইল্যান্ড এক মাইল দূরে থাকতে নোঙর ফেলবে তারা।

'ওখানে সাগরের গভীরতা দশ ফ্যাদম। ইচ্ছে করলে আরও আধ মাইল এগিয়ে, টার্গেটের আরও কাছে, বোমাটা রেখে আসতে পারবে ভূপতি—যেখানে সাগরের গভীরতা মাত্র বারো ফুট। বোমার সঙ্গে টাইমিং মেকানিজম আছে, সেটা সেট করে লেজ তুলে পালাবে। এটাই ওদের প্ল্যান বলে মনে হচ্ছে আমার।

'ভোরের আলো ফোটার আগেই সাগরের ওই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে জলপরী। ডিফেন্স আইল্যান্ডকে যথেষ্ট দূরে রেখে পাশ কাটাতে পারে, চলে যেতে পারে ইন্দোনেশিয়ার দিকে। আবার ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে শ্রীলঙ্কার দিকেও ছুটতে পারে।

'তবে বোমাটা ঠিক সতেরো ঘণ্টায় না ফাটিয়ে, আরও পরেও ফাটানোর ব্যবস্থা করতে পারে ভূপতি। সেক্ষেত্রে এখনই পালিয়ে না গিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে যেতে পারে সে। তা যদি যায়, সংক্ষিপ্ত রুট ধরে বারে-স্টাইন আইল্যান্ডের পাশ ঘেঁষে সরু খাঁড়িতে ঢুকবে, মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পাড়ি দিয়েই পৌঁছে যাবে হারবারে।

'ওখানে পৌঁছে অপেক্ষা করবে ভূপতি। ভারত সরকার যদি টাকা দিতে রাজি হয়, চুপিসারে কাউকে পাঠিয়ে বোমাটা অকেজো করে দিয়ে আসবে। আর তা না হলে, বোমাটা ফাটার কয়েক ঘণ্টা আগে নিরাপদ দূরত্বে পালাবে। আর যদি মেয়েটির মুখ খোলাতে পেরে থাকে…'

'আমার বিশ্বাস মেয়েটি মুখ খুলবে না,' বলল অনিল। 'আর খুললেই বা কী? গলায় ভারী কিছু ঝুলিয়ে ইয়ট থেকে তাকে ফেলে দেবে ভূপতি, তারপর হারবারে ফিরে এসে বলবে ট্রেজার হান্ট করার সময় তার অ্যাকুয়ালাং বিকল হয়ে যায়। আমি বলতে চাইছি, পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরবে সে ঠিকই। ওই ব্যাটার কাভার যথেষ্ট মজবুত। নরকোন্দমের ওদিকে ডুবো পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের ঢালে বিধ্বস্ত জাহাজের কার্গো ছড়িয়ে থাকতে পারে, এ-সব আগে আমরা ভেবে দেখিনি। কিন্তু পুরানো চার্টে চোখ বুলাবার পর এখন দেখতে পাচ্ছি ভূপতি তার ট্রেজার হান্ট ভুয়া নয় বলে প্রমাণ করতে পারবে।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' বললেন কমান্ডার সিঙ্কিয়া। 'আমরা কি জানি, বোমাটা ইয়ট থেকে কীভাবে নামানো হবে, তারপর টার্গেট এরিয়াতেই বা কীভাবে বসানো হবে? চার্টে চোখ বুলালেই বোঝা যায় জলপরীকে নিয়ে ডিফেন্স আইল্যান্ডের খুব বেশি কাছে যেতে পারবে না ভূপতি, গেলে মিসাইল ঘাঁটির ওয়াটারফ্রন্ট গার্ডরা তার জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দেবে। আমার জানামতে মহড়া চলার সময় ধাওয়া করে জেলে নৌকা খেদাবার জন্যে এক ধরনের গার্ড-বোট আছে ওদের।'

রানা বলল, 'জলপরীতে একটা আন্ডারওয়াটার কমপার্টমেন্ট দেখেছি আমি। নিশ্চয় আন্ডারওয়াটার স্লেজও আছে, সেটাকে টানার জন্যে ইলেকট্রিক আরেকটা কিছুও থাকতে বাধ্য। স্লেজে বোমাটা তোলা হবে, আন্ডারওয়াটার সুইমারদের একটা টিমের সঙ্গে পাঠিয়ে কোথাও বসানো হবে, তারপর ইয়টে ফিরে আসবে তারা। তা না হলে অত সব আন্ডারওয়াটার গিয়ারের দরকার কী?'

কমান্ডার সিন্ধিয়া ধীরে ধীরে বললেন, 'বোধহয় আপনার ধারণাই ঠিক, মিস্টার রানা। কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি আছে। তা হলে আমাকে দিয়ে আপনারা ঠিক কী করাতে চান বলুন, প্লিজ।'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'অনিল।'

হাসল অনিল। 'তুমি কী বলেছ ভুলে গেছি আমি।'

তার কৌতুকে সাড়া না দিয়ে কমান্ডার সিন্ধিয়ার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল রানা। 'এধরনের লোককে ধরতে হলে কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। আমাদের উপস্থিতি যদি একটু আগে টের পেতে দিই, সরে যাবে তারা, হয়তো মাত্র কয়েক শো গজ দূরে, তারপর বোমাটা ফেলে দেবে একশো ফ্যাদম নীচে।'

'তা হলে তো দেখছি সমস্যা...'

'বোমা সহ তাদেরকে ধরার একমাত্র সময় হলো টিমটা যখন ইয়ট ছেড়ে রওনা হবে। তাদের আন্ডারওয়াটার টিমকে কাবু করবে আমাদের আন্ডারওয়াটার টিম।'

'আর দ্বিতীয় বোমাটা?' জানতে চাইলেন সাবমেরিন কমান্ডার।

'সেটা যদি ইয়টে থাকে, আমার মতে ডুবে গেলেও ক্ষতি নেই।'

চোখ নামিয়ে নিজের প্লেটের দিকে তাকালেন গুজরাল সিন্ধিয়া। ছুরি আর ফর্ক প্লেটের উপর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলেন। তারপর বরফ দেয়া কফির গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঘোরালেন বারকয়েক, বরফের টুকরোগুলো কাপের গায়ে বাড়ি খেয়ে টুংটুং আওয়াজ করল। কফিটুকু দুই ঢোকে শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে, তারপর মুখ তুলে তাকালেন—প্রথমে অনিল, তারপর রানার দিকে। 'আপনার প্ল্যানটা আমার ভাল লাগল, মিস্টার রানা। সাবমেরিনে প্রচুর অক্সিজেন বটল আছে। দশজন দক্ষ সাঁতারুও আছে। তবে লড়াই করার জন্যে তাদেরকে আমি ছুরি ছাড়া আর কিছু দিতে পারব না। কে ওদেরকে নেতৃত্ব দেবে?'

রানা বলল, 'আমি। স্কিন-ডাইভিং আমার একটা হবি। আমি জানি কোন্ মাছের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, কোনটাকে গ্রাহ্য না করলেও চলে। এ-সব বিষয়ে আপনার লোকদের আমি ব্রিফ করব...'

বাধা দিল অনিল। জেদের সুরে বলল, 'এবার কিন্তু আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'আমি তো ভাবছিলাম বেঁধে নিয়ে যাব, কারণ ওখানে তোমাকে আমার দরকার হবে।'

চেয়ার ছাড়লেন কমান্ডার। 'ইন্টারকমে কথা বলি ওদের সঙ্গে। তারপর চার্ট নিয়ে বসব। গিয়ারগুলোও একবার চেক করে দেখতে হবে। দেখা যাচ্ছে,

ঝিমিয়ে নেয়ার সময় আসলে আপনারা পাচ্ছেন না!'

কমান্ডার চলে যাওয়ার পর অনিল বলল, 'এসো, কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা করি। কী ধরনের ফরমেশন-এ সাঁতার কাটব আমরা? কিছু ছুরি দিয়ে বল্লম তৈরি করা যায় না? আরেকটা সমস্যার কথা ভেবেছ? প্রায় অন্ধকারে কে কোন্ দলের লোক চিনব কীভাবে?'

ডিউটি অফিসারের একটা বাঙ্কে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল রানা, অ্যালার্ম বেলের আওয়াজে জেগে উঠল। পি.এ. সিস্টেম থেকে কর্কশ যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ডাইভিং স্টেশন! ডাইভিং স্টেশন!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রানার বাঙ্ক সামান্য কাত হলো, বদলে গেল দূর থেকে ভেসে আসা ইঞ্জিনের গুঞ্জন।

বাঙ্ক থেকে নেমে অ্যাটাক সেন্টারে চলে এল রানা। অনিল আগেই পৌঁছেছে। প্লট-এর দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন কমান্ডার। তাঁর চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। বললেন, 'দেখা যাচ্ছে আপনাদের ধারণাই ঠিক। রেইডারে আমরা জলপরীকে পেয়ে গেছি। কমবেশি পাঁচ মাইল সামনে আর দুই পয়েন্ট স্টারবোর্ডের দিকে।'

'গতি?'

'ত্রিশ নট। অন্য কোন জাহাজ এত বেশি গতি তুলতে পারবে না। তা ছাড়া, এটা কোন আলো জ্বালেনি। স্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখতে পারেন। পিছনে টগবগ করে ফুটছে পানি, প্রচুর ফসফরাস দেখা যাচ্ছে। এখনও চাঁদ ওঠেনি, তারপরও চোখে অন্ধকার সয়ে এলে সাদাটে ঝলক দেখতে পাবেন।'

রাবার আই সকেটের দিকে ঝুঁকল রানা। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে দেখতে পেল ও, দিগন্তের কাছে নরম আর সাদা একটা দাগ। সিধে হয়ে পিছিয়ে এল। 'কোর্স?'

'আমাদের মতই, দক্ষিণে যাচ্ছে। আমরা এখন আরও গভীরে নেমে গতি একটু বাড়াব। পেয়েও হারাতে রাজি নই, তাই সোনার-এও ওটাকে ধরে রেখেছি আমরা।'

'স্পিড বাড়ালাম,' জানতে চাইল রানা, 'তারপর?'

'প্রথমে সমান্তরাল রেখায় পৌঁছাতে চাই,' বললেন কমান্ডার। 'তারপর ধরা না দিয়ে যতটা পারা যায় কাছাকাছি হব। আবহাওয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে দক্ষিণমুখী ভাল বাতাস থাকবে, কিছুটা সুবিধে পাব আমরা।'

'কী সুবিধে?' খুঁটিনাটি সবই জানা দরকার রানার।

'সুইমিং পার্টি নামাবার সময় মাঝারি আকারের ঢেউ থাকলে ভাল, নাইট

গ্লাস কিংবা বিনকিউলারে আমাদেরকে দেখা যাবে না। এই যে,' হাত তুলে শক্ত-সমর্থ এক লোককে দেখালেন কমান্ডার সিন্ধিয়া, 'পেটি অফিসার ধীরাজ। সুইমিং পার্টির কমান্ডে থাকবে, অবশ্যই আপনার ও মিস্টার অনিলের অধীনে। তাকে নিয়ে দশজন ওরা। এক সঙ্গে বসে সিগনাল, ফরমেশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। সার্জেন্ট বীরাপ্পন অস্ত্রের ব্যবস্থা করছে।'

'আপনি হাসছেন, কমান্ডার,' বলল অনিল।

'আমাদের বীরাপ্পন। ছুরিগুলোতে এমনভাবে শান দিয়েছে, আঙুল ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। ডগাগুলো সুঁইয়ের মত চোখা করে ফেলেছে। তারপর প্রতিটি ছুরি একটা করে লম্বা হাতলের মাথার সঙ্গে বেঁধেছে।'

'অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে একটা করে বল্লম থাকবে?'

'হ্যাঁ। ঠিক আছে তা হলে, আবার দেখা হবে।' প্লট-এর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন কমান্ডার।

পেটি অফিসার ধীরাজের পিছু নিয়ে নীচের ডেকে নামল রানা আর অনিল। ইঞ্জিন রুম হয়ে রিপেয়ারিং শপ-এ চলে এল।

রিপেয়ারিং শপটা বেশ লম্বা, ছোট-বড় নানা আকৃতির মেশিন দেখা যাচ্ছে। এক কোণের ফাঁকা একটা জায়গায় জড়ো হয়েছে বেদিং ট্রাঙ্ক পরা নয় জন সাঁতারু, তাদের রোদে পোড়া বলিষ্ঠ শরীর চকচক করছে। আরেক কোণে ধূসর ওভারঅল পরা দু'জন লোক আধো অন্ধকারে একটা লেদ মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে শান দিচ্ছে ছুরিতে। ছুরির ফলা থেকে রাশি রাশি আগুনের ফুলকি ছুটছে। দেখা গেল কয়েকজন সাঁতারুর হাতে এরই মধ্যে একটা করে বল্লম পৌঁছে গেছে।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে একটা বর্শা পরীক্ষা করল রানা। সত্যি খুব কাজ দেবে। এমনকী হাঙরের মোটা চামড়াও ভেদ করে যাবে, এত ধার। কিন্তু শত্রুর হাতে কী থাকবে? নিশ্চয়ই হারপুন গান। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণদের দিকে তাকাল রানা। আহত হবে ওরা। হয়তো অনেকেই। কেউ কেউ মারাও যেতে পারে।

রানা লক্ষ করল, সাঁতারুরা প্রায় সবাই ফরসা। চাঁদের আলোয় বিশ ফুট দূর থেকে দেখা যাবে ওদেরকে। এই দূরত্ব হারপুন গানের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু বর্শার নাগালের বাইরে।

পেটি অফিসারের দিকে ফিরল রানা। 'সাবে বোধহয় রাবার সুট নেই?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আছে তো, মিস্টার রানা,' জবাব দিল পেটি অফিসার ধীরাজ। 'শীতের সময় পানিতে নামার জন্যে দরকার হয়। কেন বলুন তো?'

'আমাদের সবার জন্যে লাগবে,' বলল রানা। 'আরেকটা কাজ করতে হবে।'

'প্লিজ, মিস্টার রানা।'

'সাদা কিংবা হলুদ সংখ্যা। বড় আকারে পেইন্ট করতে হবে সাঁতারুদের পিঠে। কে কোন্ দলের চেনার জন্যে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' নিজের লোকদের ডাকল ধীরাজ। 'জুগনু, প্রতিম, শংকর! যাও, কোয়ার্টারমাস্টারের কাছ থেকে টিমের সবার জন্যে রাবার সুট নিয়ে এস। আকাশ, স্টোর থেকে এক বালতি রাবার সলিউশন পেইন্ট নিয়ে এস, তারপর সুটের পিছনে এক-দুই করে সংখ্যা লেখো। প্রতিটি সংখ্যা এক ফুট হবে। এক থেকে বারো। জলদি!'

'শেষ তিনটে নম্বর ছোট হয়ে যাবে তা হলে,' হাসল রানা। 'তার চেয়ে যেহেতু আমরা ধীরাজ গ্রুপ, সবার পিঠে ইংরেজি "ডি" অক্ষরটা লিখলে কেমন হয়?'

রানার প্রস্তাব মেনে নিল সবাই।

প্রকাণ্ড বাদুড়ের মত চকচকে কালো সুটগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সাঁতারুদের এক জায়গায় জড়ো করে ব্রিফ করছে রানা।

পানির তলায় পুরোদস্তুর একটা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে ওরা। যুদ্ধে যা হয়, হতাহতের ঘটনাও ঘটবে। কেউ কি তার সিদ্ধান্ত বদলাতে চায়?

উজ্জ্বল মুখগুলোয় নিঃশব্দ হাসি ফুটল। আবার শুরু করল রানা।

ঠিক আছে। ইয়ট থেকে নামার পর সাঁতরাতে হবে দশ-বারো ফুট গভীর পানিতে, সিকি কিংবা আধ মাইলটাক। চাঁদ থাকবে, কাজেই কমবেশি আলো থাকবে। সাগরের তলায় সাদা বালি আছে, তবে ঘাসও থাকতে পারে।

ঝাঁকটা হবে ত্রিভুজ আকৃতির। মাথার দিকে রানা থাকবে। ওর পিছনে অনিল। তিন নম্বরে পেটি অফিসার ধীরাজ। তার পিছনে দু'জন, তাদের পিছনে তিনজন–এইভাবে। ঠিক আছে? সবাই যে যার সামনের সংখ্যাকে অনুসরণ করলে দিকভ্রান্ত হওয়ার কিংবা হারিয়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই।

ভোর রাতটা মাছেদের খাওয়ার সময়, কাজেই খেয়াল রাখতে হবে আশপাশে বড় কোনও মাছ আছে কিনা। তবে কোনও মাছ এগিয়ে না এলে তাকে বিরক্ত করার দরকার নেই।

অস্ত্রগুলো মারাত্মক, একটু অসতর্ক হলে নিজেরাই আহত হবে, কাজেই সাবধান।

যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করতে হবে।

শত্রুদের কাছে হারপুন গান থাকবে। রেঞ্জ বিশ ফুটের মত। তবে রিলোড করতে সময় নেয়। কেউ যদি তোমার দিকে লক্ষ্যস্থির করে, নিজেকে যতটা সম্ভব ছোট টার্গেটে পরিণত করতে হবে। পানিতে খাড়া না থেকে, লম্বা হওয়া যায়–শোয়ার ভঙ্গিতে।

দশ মিনিট পরে থামল রানা। জানতে চাইল, 'কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

'আন্ডারওয়াটার সিগনাল কী হবে, সার? ধরুন একটা মাস্ক নষ্ট হয়ে গেল, কিংবা…'

'যে-কোন ইমার্জেন্সির জন্য বুড়ো আঙুলটা নীচের দিকে তাক করতে হবে। হাত সোজা সামনে লম্বা করবে বড় মাছ দেখলে। তর্জনী ওপর দিকে খাড়া করলে বুঝতে হবে বলতে চাইছি: বুঝেছি, কিংবা তোমাকে সাহায্য করতে আসছি আমি।'

পি.এ. সিস্টেম থেকে হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'সুইমিং পার্টি এস্কেপ হ্যাচে চলে এসো। আবার বলছি, সুইমিং পার্টি এস্কেপ হ্যাচে চলে এস। ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করো। ইকুপমেন্ট সংগ্রহ করো। মিস্টার রানা, অ্যাটাক সেন্টারে চলে আসুন, প্লিজ।'

ইঞ্জিনের গুঞ্জন চাপা গোঙানির মত শোনাচ্ছে। তারপর থেমে গেল। সাগরের তলায় পৌঁছাল মাভৈ, সামান্য একটু ঝাঁকি খেলো ওরা।

ষোলো

রাশি রাশি বুদ্বুদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এস্কেপ হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ওর উপরে সাগরের সারফেস আলোড়িত পারদ ভর্তি প্লেটের মত। বুদ্বুদের বেলুনগুলো ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটছে, রুপালি সিলিঙে বাড়ি খেয়ে ফেটে যাচ্ছে খুদে বোমার মত।

সারফেস থেকে দশ ফুট নীচে স্থির হলো রানা। মাভৈকে এ-মুহূর্তে অশুভ আর বিপজ্জনক দেখাচ্ছে। এস্কেপ হ্যাচ বিস্ফোরিত হলো, যেন ওকে লক্ষ্য করে ফায়ার করা হয়েছে মাভৈ থেকে। কালো একটা মিসাইল ছুটে আসছে। ঝাঁক ঝাঁক রুপালি বুদ্বুদ নিয়ে মিসাইল নয়, ছুটে আসছে অনিল।

তার পথ ছেড়ে দিল রানা, সাঁতার কেটে উঠে এল সারফেসে। ছোট-ছোট ঢেউ-এর আড়ালে মাথা তুলে সাবধানে দূরে তাকাল ও।

আলো না জ্বালায় কালো একটা লম্বা দাগের মত দেখাচ্ছে জলপরীকে। ওর

বাঁদিকে, এক মাইল দূরেও নয়।

আরও এক মাইল পুবে রয়েছে ডিফেন্স আইল্যান্ড, সাদা বালি আর ছোট ঢেউ একটা রেখা তৈরি করেছে ওটার তীরে। দ্বীপটার উপর, মিসাইল নিক্ষেপ করার সারি সারি মঞ্চের মাথায় লাল এয়ারক্রাফট ওয়ার্নিং লাইট জ্বলছে। দেখার আর কিছু নেই, ডুব দিয়ে নীচে নেমে এল রানা। দশ ফুট গভীরে স্থির হলো, যেদিকে রওনা হবে সেদিকে মাথা রেখে শরীরটা আকৃতি নিল কমপাসের কাঁটার মত। ফিনগুলো হালকা ভাবে নেড়ে পজিশনটা ধরে রাখছে, অপেক্ষা করছে টিমের বাকি সবার জন্য।

দশ মিনিট আগে নোঙর ফেলেছে জলযানটা এক মাইল দূরে। ওটা যে জলপরী, এ-ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে। ডাক পেয়ে রানা অ্যাটাক সেন্টারে পৌঁছাতে, সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন কমান্ডার সিন্ধিয়া।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে নোঙর ফেলেছে জলপরী, তারপর থেকে বিচিত্র সব আন্ডারওয়াটার সাউন্ড ধরা পড়ছে সোনার-এ। সন্দেহ নেই, আন্ডারওয়াটার কমপার্টমেন্ট থেকে কিছু একটা বের করছে তারা। নিশ্চয়ই বোমাটাই হবে।

সিদ্ধান্ত হলো, টিম নিয়ে রানা সারমেরিন থেকে নেমে গেলেই সারফেস অ্যান্টেনা খাড়া করবেন কমান্ডার, ভারতীয় নেভি আর ডিফেন্স আইল্যান্ডের মিসাইল ঘাঁটিকে সতর্ক সংকেত পাঠাবেন। তারপর বিশ ফুট নীচে নেমে দুটো টিউব লোড করার নির্দেশ দেবেন। পেরিস্কোপে চোখ রাখা হবে। পেটি অফিসার ধীরাজকে অতিরিক্ত ফ্লেয়ার দেওয়া হয়েছে, পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখলে সংকেত দেবে সে।

রানার কাঁধে টোকা পড়ল। অনিল। মাস্কের ভিতর নিঃশব্দে হাসছে সে, একটা আঙুল খাড়া করল। নিজের পিছনে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। নেভির সাঁতারুরা এরইমধ্যে পজিশন নিয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল ও।

কালো সুটের ভিতর গরম আর চটচটে লাগছে, মাউথপিস দিয়ে বেরিয়ে আসা রিসার্কিউলেটিং অক্সিজেনে রাবারের গন্ধ রয়েছে। তবে এ-সব ভুলে গিয়ে কাজে মন দিল রানা। কোর্স ঠিক রাখছে সারফেসে মাথা তুলে থাকা প্রবালের একটা স্তম্ভের উপর চোখ রেখে। অগভীর পানির দিকে যাচ্ছে ওরা। অনেক নীচে চাঁদের নৃত্যরত আলো পৌঁছাতে পারেনি। তবে সাদা বালির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সাগরতল যেখানে গাঢ়, বুঝতে হবে ঘাস রয়েছে সেখানে।

প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে রানা, টর্পেডো আকৃতির একটা মাছ দেখতে পাবে, টিমটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। শোনা যায় বঙ্গোপসাগরের এই শেষ প্রান্তে দৈত্যাকার স্কুইডও নাকি আছে।

নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য কাঁধের উপর দিয়ে দ্রুত একবার পিছন দিকটা দেখে নিল রানা। হ্যাঁ, সবাই রয়েছে–এগারোটা চকচকে মুখোশ, পিছনে পানিতে ঝাপটা মারছে ফিনগুলো, চাঁদের আলো লেগে ঝিলিক দিচ্ছে বল্লমের ফলা।

সামনে এক ঝাঁক প্রবালের স্তূপ। পানি অগভীর হতে শুরু করেছে। রংচঙে ছোট মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। সাঁতারের গতি কমিয়ে আনল রানা। অনুভব করল ওর ফিনে বাড়ি খেলো অনিল। খালি হাতটা তুলে গতি কমাবার সংকেত দিল ও।

এখন অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে রানা, ওর নেভিগেশন মার্ক-এর মাথায় ভেঙে পড়া ঢেউয়ের রুপালি ফেনা খুঁজছে। ওই তো, ওর বাঁদিকে। কোর্স ছেড়ে প্রায় পনেরো ফুট সরে এসেছে ও। ঘুরে প্রবাল স্তম্ভটার দিকে এগোল। তারপর থামার সংকেত দিয়ে আড়াল নিল ওটার পিছনে। এবার ধীরে ধীরে মাথা তুলল সারফেসে।

প্রথমে জলপরীর দিকে তাকাল রানা। হ্যাঁ, ইয়টটা এখনও রয়েছে ওখানে। কাছ থেকে, চাঁদের আলোয়, এখন আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডেকে নেই কেউ, যেন পরিত্যক্ত একটা জাহাজ ঢেউয়ের দোলায় অলস ভঙ্গিতে দুলছে। সারফেসে চোখ বুলাল রানা। কিছু নেই। স্তম্ভের আরেক দিকে সরে এসে উঁকি দিল রানা। এদিকের সারফেসেও কিছু নেই। পাঁচ কি ছয়শো গজ দূরে পরিষ্কার তটরেখা আর সৈকত। খালি চ্যানেলের সারফেসে কোনও আলোড়ন আছে কিনা পরীক্ষা করছে ও।

কী ওটা? একশো গজ দূরে, ছোট-বড় কয়েকটা প্রবাল স্তম্ভের মাঝখানে কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। নড়ছে। আরে, একটা মাথা! মাথাটা নিষ্প্রভ হলেও, নীচের মাস্ক চকচক করছে। সারফেস ভেঙে উঠেছিল, দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডুব দিল আবার।

দম আটকাল রানা। অনুভব করল রোমাঞ্চিত হৃৎপিণ্ড ওর রাবার সুটের ভিতর দিকে বাড়ি মারছে। আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর, দাঁতের ফাঁক থেকে ব্রিদিং টিউব টেনে খুলে নিয়ে ফুসফুসের বাতাসকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে যেতে দিল।

নতুন করে ফুসফুস ভরে নিয়ে ডুব দিল রানা। ওর পিছনে মুখোশগুলো তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে সংকেত পাওয়ার। খাড়া বুড়ো আঙুলটা কয়েকবার উপর দিকে ঝাঁকাল ও। কাছাকাছি কয়েকটা মুখোশের ভিতর সাদা দাঁত দেখতে পেল, হাসছে ওরা। হাতের বর্শাটা নীচের দিকে গাঁথার ভঙ্গি করল ও, অর্থাৎ আক্রমণে যাচ্ছে টিম। ওর পিছু নিয়ে রওনা হলো সবাই।

প্রবালের স্তূপ আর স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে এগোল ওরা। এখন দরকার গতি আর নির্ভুল দিক নির্দেশনা। রানার সামনে থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে মাছগুলো। প্রবালের স্তম্ভ, স্তূপ, বিস্তৃতি আর প্রাচীর জ্যান্ত হয়ে উঠেছে বারোটা দ্রুতগতি শরীরের শক-ওয়েভে।

পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গতি কমিয়ে অ্যাটাকিং লাইন তৈরির সংকেত দিল রানা। তারপর আবার এগোল, তবে সাবধানে, ধীরে ধীরে। চাপ পড়ায় লালচে হয়ে আছে চোখ, অপলক তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। সাগরের তলায় এবড়োখেবড়ো কত রকমের আকৃতি রয়েছে, তার উপর আছে কুয়াশার মত ঝাপসা ভাব। হ্যাঁ! হলদেটে চামড়ার ঝলক দেখা গেছে। ওই যে, ওই যে আরু ওই যে! হাতটা তুলে সেদিকে ঝাঁকাল রানা। পর পর দু'বার।

অ্যাটাক! অ্যাটাক!

তবে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে নির্দেশ দিয়েই খালাস, ব্যাপারটা সেরকম নয়। সংকেত দেওয়ার পরপরই সবার আগে ছুটল রানা, হাতের অস্ত্রটাকে সামনে ধরে আছে বল্লমের মত করে।

রানার গ্রুপ আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের তৈরি রেখার মাঝখানে। কিন্তু তাদের গতি দেখে বিস্মিত হলো রানা। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ভূপতির লোকেরা তাদের অ্যাকুয়ালাঙের জোড়া সিলিন্ডারের মাঝখানে কমপ্রেশড-এয়ার স্পিড-প্যাক ব্যবহার করছে, যার কাজ হলো খুদে আকারের প্রপেলার অপারেট করা। পায়ে ফিন থাকায় গতি তো বাড়েই, পিঠে প্রপেলার থাকায় সেটা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তবে ভাঙাচোরা প্রবালের রাজ্যে প্রতি মুহূর্তে বাধা পাচ্ছে তারা, তার উপর টু-সিটার সাবমেরিনকে এগোবার জন্য জায়গা ছাড়তে হচ্ছে, ফলে রানার হিসেবে তাদের গতি ওদের চেয়ে বড়জোর এক নট বেশি হতে পারে।

শত্রুর ঝাঁকের মাথা আর লেজের মাঝখানে আঘাত করতে চেয়েছিল রানার গ্রুপ। কিন্তু ঝাঁকটার গতি আন্দাজের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে টার্গেট সরে যাচ্ছে দূরে। তারপর দেখা গেল শত্রুরা সংখ্যাতেও অনেক বেশি। বারো পর্যন্ত গুণে থেমে গেল রানা। তাদের প্রায় সবার কাছেই হারপুন গান রয়েছে, পায়ের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো এক্সট্রা স্পিয়ার সহ। শক্তির তুলনা করলে ওদের অবস্থা ভাল নয়। শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিয়ে আরও খানিক এগোতে চাইছে ও। তাদেরকে বল্লমের নাগালে পেতে হবে।

ত্রিশ গজ। বিশ। চট করে একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। ওর ছয়জন লোক কাছেই রয়েছে, হাত বাড়ালে ছুঁতে পারবে। বাকি সবাই আঁকাবাঁকা একটা রেখা তৈরি করে এগিয়ে গেছে। এখনও ভূপতির লোকেদের মাস্ক সামনের দিকে

তাক করা। অসংখ্য প্রবাল স্তূপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসা কালো আকৃতিগুলোকে এখনও দেখতে পায়নি তারা।

তবে পরমুহূর্তে, রানা যখন ভূপতির পিছনের গার্ডের সঙ্গে একই লেভেলে চলে আসছে, সাদা বালির ছোট্ট একটা বিস্তৃতিতে ছায়া পড়ল ওর। দোষটা চাঁদকেই দিতে হয়।

এক লোক ঝট করে চারদিকে তাকাল। তারপর আরেকজন। প্রবালের একটা মোটা পিলারে পা ঠেকিয়ে সামনে ঝাঁপ দিল রানা।

নিজেকে রক্ষা করার কোন সুযোগই পায়নি লোকটা। পাঁজরে গাঁথা ছুরি নিয়ে পিছনের লোকটার সঙ্গে ধাক্কা খেলো সে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বল্লমটা খুলে আনল রানা। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে কুঁজো হয়ে গেল লোকটা, পাঁজর খামচে ধরেছে।

দিক্-বিদিক্ ছুটে পালাচ্ছে নগ্ন লোকগুলো, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই বল্লমের খোঁচা মেরে রক্তাক্ত করছে রানা। তবে গতি বেশি হওয়ায় বেশির ভাগই খুব তাড়াতাড়ি ওর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

রানার সামনে দিয়ে এক লোক পালাচ্ছিল। সন্দেহ আছে নাগাল পাবে কিনা, তারপরও খালি হাতটা দিয়ে বাড়ি মারল ও। লোকটার মাস্কের কাঁচ ভেঙে গেল। ফিন ছুঁড়ে সারফেসের দিকে উঠে যাচ্ছে সে, কায়দা মত পেয়ে রানার মুখে একটা লাথিও চালাল।

সেই একই মুহূর্তে একটা স্পিয়ার আঘাত করল রানাকে। ওর পেটকে রক্ষা করছে রাবারের আবরণ, সেটা ছিঁড়ে ভিতরে ঢুকে গেল স্পিয়ারের ডগা। ব্যথা পেল রানা; ভেজা ভেজা কিছু অনুভব করল–রক্ত, নাকি সাগরের পানি বুঝতে পারল না। ইস্পাত ঝলসে উঠতে দেখে ঝট্ করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ও। অস্ত্রের বাঁটটা ওর মাথায় লাগল, তবে সেটার বেশিরভাগ শক্তি পানির কুশন ভেদ করতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মাথাটা ঘুরে উঠল, দৃষ্টি হয়ে এল ঝাপসা। নিচু একটা প্রবাল প্রাচীরে হেলান দিল ও, অপেক্ষা করছে কখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে। কালো স্রোতের মত পাশ কাটাতে দেখছে নিজের টিমের লোকদেরকে। সবাই এখন লড়াইয়ে ব্যস্ত। চারদিকের পানি কালো হয়ে যাচ্ছে রক্তে।

যুদ্ধক্ষেত্র এখন ফাঁকা জায়গায় সরে এসেছে, চারপাশ প্রবালের স্তূপ দিয়ে ঘেরা। জায়গাটার দূর প্রান্তে সাগরতলে স্থির হয়ে রয়েছে একটা আন্ডারওয়াটার স্লেজ। স্লেজের উপর রাবার দিয়ে মোড়া লম্বা আর মোটা কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছে রানা। স্লেজের সামনে রয়েছে রুপালি টর্পেডো আকৃতির ছোট একটা সাবমেরিন। ওখানে জড়ো হয়েছে একদল লোক, তাদের মধ্যে লম্বা-চওড়া

ধনঞ্জয় ভূপতিকে অনায়াসেই চিনতে পারা যাচ্ছে।

পিছু হটে প্রবাল প্রাচীরের আড়ালে মিলিয়ে গেল রানা, ওটার আরেক প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে বালির উপর ক্রল করে এগোচ্ছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামতে হলো ওকে। ছায়ার ভিতর শক্ত-সমর্থ একটা কাঠামো নড়ে উঠল। তার অস্ত্র ধরা হাতটা লম্বা করা, সাবধানে লক্ষ্যস্থির করছে।

টার্গেট অনিল।

নিরস্ত্র অনিলের গলাটা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরেছে ভূপতির আরেক লোক। গলা থেকে হাত ছাড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে অনিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। সজোরে দু'বার ফ্লিপার ঝাপটাল রানা, তারপর ছয় ফুট দূর থেকে বল্লমটা ছুঁড়ল। হালকা কাঠের হাতল পানির বাধা অগ্রাহ্য করে কত জোরেই বা ছুটবে, তারপরও ফলাটা শত্রুর হাত কেটে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অস্ত্রটার মাজল থেকে বিস্ফোরিত হলো গ্যাসের বুদ্বুদ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো লোকটা, স্পিয়ারটা অনিলকে লাগেনি।

তবে খালি অস্ত্রটা সবেগে রানার দিকে ঘোরাল সে। সরে গেল রানা, চোখের কোণ দিয়ে দেখল ধীর গতিতে সারফেসের দিকে উঠে যাচ্ছে স্পিয়ারটা।

লোকটার পা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ও। এক হাত দিয়ে পেঁচিয়ে সাগরের মেঝে থেকে তুলে আনল ওগুলো। ঠিক এই সময় আবার হারপুন গানের মাজল আঘাত করল ওর কপালে। ব্যথাটা তীব্র নয়। লোকটা আবার আঘাত করতে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে এক টানে তার মাস্কটা খুলে আনল মুখ থেকে।

সাঁতরে এক পাশে সরে এসে লোকটাকে দেখছে রানা। সাগরের লোনা পানিতে অন্ধ হয়ে আছে, হাতড়াবার ভঙ্গিতে সারফেসের দিকে উঠে যাচ্ছে। হাতে মৃদু খোঁচা অনুভব করল রানা।

অনিল। অক্সিজেন টিউবটা খামচে ধরে আছে সে। মাস্কের ভিতর বিকৃত হয়ে রয়েছে মুখ। নিস্তেজ ভঙ্গিতে উপর দিকটা দেখাল। কী বলতে চায় বুঝতে পারল রানা। একহাতে অনিলের কোমর পেঁচাল, তারপর পনেরো ফুট উপরের সারফেস লক্ষ্য করে লাফ দিল।

রুপালি সিলিং ভেঙে মাথা তুলছে ওরা, মুখ থেকে ভাঙা টিউব টেনে বের করে আনল অনিল, ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে। একটু শান্ত হতে তাকে প্রবালের একটা ঝোপের কাছে সরিয়ে আনল রানা। রাগের সঙ্গে ওকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল অনিল, ইঙ্গিতে বলল তাকে ফেলে লড়াইয়ে ফিরে যাক ও।

আবার ডাইভ দিল রানা।

এবার প্রবালের জঙ্গলে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ভূপতির খোঁজে রওনা হলো রানা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ও। মাঝে মধ্যে দু'একটা বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের দৃশ্য ধরা পড়ছে চোখে। একবার এক লোকের নীচ দিয়ে এগোল—ওর মাভৈ টিমের সদস্য, সারফেস থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তবে মুখটা পানিতে ডোবা, আলোড়িত চুলের মাঝখানে, না আছে মাস্ক না আছে অক্সিজেন টিউব। মুখটা মৃত্যুর বীভৎসতা নিয়ে হাঁ করা।

সাগরের তলায়, প্রবাল ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ছড়িয়ে রয়েছে অক্সিজেন প্যাক, কালো রাবারের ফালি, গোটা একটা অ্যাকুয়ালাঙ আর CO_2 গানের বেশ কিছু স্পিয়ার। ঝুঁকে দুটো স্পিয়ার তুলল রানা। তারপর সাবধানে চলে এল ফাঁকা যুদ্ধক্ষেত্রের কিনারায়।

স্লেজটা এখনও সেই জায়গাতেই রয়েছে। অস্ত্রধারী দুজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে সেটাকে। কিন্তু আশপাশে কোথাও ভূপতিকে দেখা যাচ্ছে না। চাঁদের আলো যেখানে পৌঁছায়নি, ঝাপসা হয়ে আছে জায়গাটা, সেদিকে তাকিয়ে ঢেউ খেলানো বালির আভাস পেল রানা। কিন্তু কোন নড়াচড়া নেই। এদিক-ওদিক যুদ্ধ চলছে, তবে ওর টিমের কারও সাহায্য দরকার বলে মনে হলো না। রানা ভাবল, সারফেসে কী ঘটছে? অনিলকে নিয়ে যখন উঠেছিল, লাল ফ্লেয়ারের আলোয় আলোকিত ছিল সাগর। মাভৈ থেকে রেসকিউ ডিঙ্গি আর কতক্ষণ পর পৌঁছাবে অকুস্থলে? ওর কি এখানেই থাকা উচিত, বোমাটার পাহারায়?

অকস্মাৎ রানার ডান পাশের ঝাপসা দিকটা থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল টর্পেডো আকৃতির আন্ডারওয়াটার চ্যারিয়ট। দু'দিকে পা ঝুলিয়ে স্যাডলের উপর বসে রয়েছে ভূপতি। বেশি গতি পাওয়ার জন্য ছোট পারপ্লেক্স শিল্ডের পিছনে ঝুঁকে রয়েছে। তার বাম হাতে মাভৈ সাবমেরিনের একজোড়া বল্লম দেখা যাচ্ছে, সামনের দিকে তাক করা, ডান হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে জয়স্টিক।

ভূপতিকে আসতে দেখে নিজেদের অস্ত্রও বালিতে নামিয়ে রাখল গার্ড দুজন, তারপর স্লেজের কাপলিং ধরে উঁচু করল। গদি কমিয়ে তাদের দিকে ভেসে আসছে ভূপতি। গার্ডদের একজন স্টিয়ারিং হুইল ধরে চ্যারিয়টকে পিছু ঠেলে কাপলিংগুলোর দিকে নিয়ে গেল। কেটে পড়বার তালে আছে তারা! প্রবালের জঙ্গল আর অগভীর পানি পার হয়ে বোমাটা গভীর সাগরে ফেলে দেবে ভূপতি, কিংবা কোথাও পুঁতে রাখবে। জলপরীর দ্বিতীয় বোমাটারও একই পরিণতি হতে পারে। প্রমাণ সরিয়ে ফেলার পর ভূপতি বলবে, প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেজার হান্টাররা তার উপর হামলা চালিয়েছে। কী করে জানবে ওরা ভারতীয় নেভির সাবমেরিন থেকে এসেছে? তার লোকেরা শার্ক গান নিয়ে লড়েছে, তবে শুধুমাত্র আক্রান্ত হওয়ার পরে। অর্থাৎ ট্রেজার হান্ট কাভারটা আবার সব ঢেকে ফেলবে।

লোক দুজন এখনও কাপলিং নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে। ব্যাকুল, অস্থির ভাব নিয়ে বারবার পিছন দিকে তাকাচ্ছে ভূপতি। দূরত্বটা মেপে নিয়ে প্রবালে পা ঠেকাল রানা, তারপর লাফ দিল।

ঠিক সময় মত ঘাড় ফেরাল ভূপতি। ডান হাত দিয়ে বল্লম চালিয়েছে রানা, একটা কনুই তুলে সেটাকে এক পাশে সরিয়ে দিল সে। রানার বাম হাতের বল্লমটাও টার্গেট খুঁজে পায়নি, ভূপতির পিঠে আটকানো অ্যাকুয়ালাঙ সিলিন্ডারে লেগেছে। মাথা সামনে দিয়ে ছুটে গেল রানা, হঠাৎ হাত দুটো বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল ভূপতির মুখের এয়ার টিউব। নিজেকে রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল মিস্টার এক্সের দুই হাত। বল্লম দুটো ফেলে দিয়েছে সে। তবে ছেড়ে দেওয়ার আগে জোরে একটা টান দিয়েছে জয়স্টিকে।

গার্ড দুজনকে পিছনে রেখে দ্রুত সামনে ছুটল চ্যারিয়ট, তির্যক একটা রেখা ধরে সারফেসের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেটার পিঠে ধস্তাধস্তি করছে দুটো মূর্তি।

এরকম আড়ষ্ট ভঙ্গিতে লড়াই করা যায় না। দুজনেরই লাইফ লাইন হলো রাবার মাউথপিস, দাঁত দিয়ে কামড়ে আটকে রেখেছে যে-যারটা, সেই সঙ্গে পরস্পরকে লক্ষ্য করে কখনও খামচি মারছে, কখনও ঘুসি। তবে দুই হাঁটু দিয়ে শক্ত করে চ্যারিয়ট ধরে আছে ভূপতি। কিন্তু ঝুলে থাকার জন্য এক হাতে ভূপতির ইকুইপমেন্ট ধরে থাকতে হয়েছে রানাকে। হাতটা খুলে নিলেই ওকে পিছনে ফেলে নাগালের বাইরে চলে যাবে চ্যারিয়ট।

কনুই দিয়ে রানার মুখে বারবার গুঁতো মারছে ভূপতি। মাস্কের অতি মূল্যবান কাঁচটাকে রক্ষা করার চেষ্টায় মাথাটা ঘন ঘন সরিয়ে নিয়ে আঘাতগুলো চোয়ালে লাগতে দিচ্ছে রানা, সেই সঙ্গে খালি হাতটা দিয়ে ওর একমাত্র টার্গেট ভূপতির কিডনিতে একের পর এক ঘুসি চালাচ্ছে।

সারফেসে উঠে এল চ্যারিয়ট। দু'পাশে প্রবালের নিচু পাঁচিল, পঞ্চাশ গজ দূরে খোলা সাগর। লেজের দিকে রানা ঝুলে থাকায় চ্যারিয়টের নাক উঁচু হয়ে আছে, পানি থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উপরে।

রানা এখন বেকায়দা অবস্থায়, অর্ধেক শরীর পানির নীচে। আর এক মিনিটের মধ্যে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নেবে ভূপতি, তারপর দুটো হাতই ওর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। ভূপতির অ্যাকুয়ালাঙ ছেড়ে দিল, দুই পায়ের মাঝখানে আটকাল টর্পেডোর পিছনটা, পিছলে নেমে এল শেষ প্রান্তে। ঘুরন্ত প্রপেলারকে এড়িয়ে ডুব দিল পানিতে, তারপর দুই হাত দিয়ে রাডার ব্লেডটা ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে ঘোরাতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে আবার খাড়া হচ্ছে চ্যারিয়ট, সেই সঙ্গে ডান দিকে পাক খেতে

যাচ্ছে। রাডারটাকে উল্টোদিকে ঘোরাচ্ছে রানা, ফলে এক সময় মনে হলো কাঁধের কাছ থেকে ছিঁড়ে আসবে হাত দুটো। প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দিতে যাবে, এমন সময় রাডারের ব্লেড ভেঙে গেল। চ্যারিয়ট হঠাৎ পাক খাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল ভূপতি।

হেরে গেছে রানা, ক্লান্তি ওকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। এই মুহূর্তে পালিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর। বোমাটাকে অচল করে দেয়া হয়েছে, চ্যারিয়ট কোনও কাজে আসবে না।

সুস্থির হওয়ার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও রানাকে দেখতে পেল না ভূপতি। তারপর চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। প্রবালের তৈরি সরু একটা গলির ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে তার শিকার। পিছু নিল সে।

আরও সরু একটা গলিতে ঢুকল রানা, জানে সামান্য হলেও বাড়তি প্রটেকশন দেবে রাবার সুট। প্রবাল ঝোপের ডগাগুলো এখানে তীক্ষ্ণ। ছায়াটার অস্তিত্ব টের পেল ও, ওকে অনুসরণ করে আসছে।

প্রবালের সরু গলিতে নামল না ভূপতি। ঝোপ-ঝাড়ের মাথার উপরে সাঁতরাচ্ছে সে, নীচে তাকিয়ে রানার মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছে।

উপরে তাকাল রানা। মাউথপিস জুড়ে সাদা দাঁত দেখতে পেল ভূপতি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, রানা এখন তার সহজ শিকার।

আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করছে রানা, ওগুলোর আড়ষ্টতা দূর করার জন্য। দৈত্যটার শক্তিশালী, লোমশ হাতগুলোর সঙ্গে কীভাবে লড়বে ও?

সরু প্যাসেজ এখন চওড়া হচ্ছে। সামনে বালিময় টানেলের আভাস। ঘোরার মত জায়গা নেই রানার। ও শুধু সাঁতার দিয়ে খোলা ফাঁদটায় পৌছাতে পারে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। এটাই একমাত্র করণীয়। ভূপতির চোখে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লাগবে ওকে। তবে ধরতে হলে নীচে নেমে আসতে হবে তাকে।

মুখ তুলে উপরে তাকাল রানা। হ্যাঁ, চকচকে বিরাট শরীরটা সাঁতার কেটে ঘোলা পানিতে বেরিয়ে আসছে, পিছনে ঝাঁক ঝাঁক রুপালি বুদ্বুদ নিয়ে। তারপর ম্লান একটা সিল মাছের মত হঠাৎ নীচের প্যাসেজ লক্ষ্য করে ডাইভ দিল সে।

শক্ত বালিতে নেমে এসে রানার সামনে দাঁড়াল ভূপতি। প্রবাল ঝোপের ফাঁক গলে ধীরে ধীরে এগোল সে, প্রকাণ্ড হাত দুটো ধরার ভঙ্গিতে সামনে বাড়ানো। তার চোখ এক পাশে ঘুরে গেল, প্রবালের একটা ঝোপে দৃষ্টি বুলাল। হঠাৎ ডান হাতটা ছুটল সেদিকে, স্যাঁৎ করে কী যেন টেনে নিল।

এতক্ষণে রানা দেখল ভূপতির হাতে আরও আটটা আঙুল গজিয়েছে, অনবরত মোচড় খাচ্ছে সেগুলো। নিজের সামনে এমন ভঙ্গিতে শিশু

অক্টোপাসটাকে ধরেছে ভূপতি, ওটা যেন একটা ফুল।

মাস্কের ভিতর লোকটার হাসি দেখতে পেল রানা। ঝুঁকে সামুদ্রিক আগাছায় মোড়া একটা পাথর তুলল ও। নাটুকে ভাব দেখাচ্ছে ভূপতি। অক্টোপাস দিয়ে বাড়ি মারার চেয়ে পাথর দিয়ে মারলে অনেক বেশি ক্ষতি হবে রানার। অক্টোপাসকে নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় ও। এই তো মাত্র একদিন আগে কয়েকশো অক্টোপাসের সঙ্গী হতে হয়েছিল ওকে। ওর উদ্বেগ ভূপতির অতিরিক্ত লম্বা হাত দুটোকে নিয়ে।

এক পা সামনে এগোল ভূপতি। তারপর আরেক পা। পা গুটিয়ে শরীরটাকে ছোট করে নিল রানা, সাবধানে পিছু হটছে যাতে ধারাল প্রবালে ঘষা লেগে রাবার না কাটে। ধীরে ধীরে, বুঝে-শুনে এগোচ্ছে ভূপতি। আর এক কি দু'পা এগিয়েই হামলা চালাবে সে।

ভূপতির পিছনে, ফাঁকা জায়গায়, অস্পষ্ট নড়াচড়া ধরা পড়ল রানার চোখে। কেউ কি সাহায্য করতে আসছে? তবে চকচকে ভাবটা ফরসা, কালো নয়; শত্রুদেরই কেউ হবে।

সামনে লাফ দিল ভূপতি।

মসৃণ প্রবালে কাঁধ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছিল রানা, ভূপতির উরু-সন্ধিতে লাথি মারার জন্য ডাইভ দিল নীচের দিকে। তবে তৈরি ছিল ভূপতি। তার হাঁটু সজোরে রানার মাথায় লাগল। সেই সঙ্গে তার ডান হাত দ্রুত নেমে এল, রানার মাস্কের গায়ে আটকে দিল অক্টোপাসটাকে। পরমুহূর্তে দু'হাত দিয়ে গলাটা ধরে হালকা একটা শিশুর মত তুলে ফেলল উপরে, বাহু দুটো সবটুকু লম্বা করে গলায় চাপ বাড়াচ্ছে।

রানা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অস্পষ্টভাবে টের পেল পিচ্ছিল শুঁড়গুলো ওর মুখের উপর কিলবিল করছে, ওর দু'সারি দাঁতে ধরা মাউথপিসটাকে পেঁচিয়ে নিয়ে টানছে। তবে মাথার ভিতর গজরাচ্ছে রক্ত, জানে নিভে যাচ্ছে জীবন প্রদীপ।

ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার। নীচে নেমে যাচ্ছে শরীরটা। কিন্তু কীভাবে, কেন নামছে ও? ওর গলায় লোহার মত শক্ত দুটো হাত ছিল, সেগুলো কোথায় গেল? অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ দুটো দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়ে আছে, অনেক কষ্টে খুলল ও। আলো লাগল চোখে। অক্টোপাসটা এখন ওর বুকে, শুঁড় তুলে নিয়ে দ্রুত খসে পড়ল প্রবাল ঝোপের দিকে। ওর সামনে রয়েছে ভূপতি।

ধনঞ্জয় ভূপতি সাদা বালিতে পড়ে নিস্তেজ, অলস ভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে। তার গলার একদিক দিয়ে ঢুকে, আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা স্পিয়ার। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটখাট একটা ম্লান কাঠামো, দেখছে

তাকে; আন্ডারওয়াটার হারপুন গানে আরেকটা স্পিয়ার লোড করছে। চাঁদের আলো মাখা লম্বা চুল একটা পরদার মত ঢেকে রেখেছে তার মুখ।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। এক পা সামনে এগোল। হঠাৎ অনুভব করল ওর হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে। চোখের সামনে কালো পর্দার মত গাঢ় অন্ধকার নেমে আসছে। প্রবালের একটা পাঁচিলে হেলান দিল ও, অক্সিজেন টিউবের চারধারে ঢিলে হয়ে আসছে ওর মুখ। মুখের ভিতর একটু একটু করে পানি ঢুকছে। না! নিজের সঙ্গে কথা বলছে রানা। না! নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনো!

একটা হাত ওর কনুই ধরল। তবে মাস্কের পিছনে তৃষ্ণার চোখ দুটো অন্য কোথাও চলে গেছে। সেই চোখে দৃষ্টি নেই, ফাঁকা। অসুস্থ সে! কী হলো ওর? হঠাৎ যেন আবার জেগে উঠল রানা। তৃষ্ণার বেদিং ড্রেসে রক্ত দেখতে পাচ্ছে ও। বিকিনির ফাঁকে ফাঁকে, সারা শরীরেই, খয়েরি রঙের দাগ–ক্ষতচিহ্ন। এখানে দাঁড়িয়ে দুজনেই মারা যাবে ওরা, যদি না কিছু করে রানা।

ধীরে ধীরে সীসার মত ভারী পা দুটো কালো ফিনগুলোকে নাড়ল। উপরে উঠে আসছে ওগুলো। দেখা যাচ্ছে খুব একটা কঠিন নয় কাজটা। আর এখন, দুর্বল ভাবে হলেও, তৃষ্ণার ফিনও সাহায্য করছে।

শরীর দুটো একসঙ্গে সারফেসে পৌঁছাল, মুখ নীচের দিকে রেখে ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর শুয়ে আছে।

ভোরের ম্লান আলো গোলাপি হতে শুরু করল।

শুরু হতে যাচ্ছে ঝলমলে নতুন একটা দিন।

সতেরো

সাদা একটা কামরা। বাতাসে অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ। ভিতরে ঢুকে নিজের পিছনে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল অনিল চ্যাটার্জি। এগিয়ে এসে বেডের পাশে দাঁড়াল। বেডে শুয়ে রয়েছে রানা, ওষুধের প্রভাবে চোখে আবার ঘুম চলে এসেছে।

'কেমন আছ, রানা?'

'খারাপ নয়। শুধু ঘুমের ঘোরটা কাটছে না।'

'ডাক্তার বলে দিয়েছেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। কিন্তু ভাবলাম তুমি হয়তো স্কোরটা জানতে চাইবে। কী?'

'অবশ্যই।' মনোসংযোগের জন্য নিজের উপর জোর খাটাতে হচ্ছে

রানাকে। ওর আসলে তেমন আগ্রহ নেই। এ মুহূর্তে শুধু মেয়েটির কথা ভাবতে পারছে।

'সংক্ষেপে সারি, কেমন? ডাক্তার এখানে আমাকে দেখতে পেলে রক্ষে নেই। দুটো বোমাই উদ্ধার করেছে ওরা। আর কুমারেশ লাহিড়ী–ফিফিসিস্ট লোকটা–ঠিক চড়ুই পাখির মত কিচিরমিচির করছে। বাসযোগ্য পৃথিবী চাই আসলে এশিয়ার প্রায় সব কটা দেশের টপ ক্রিমিনালদের একটা সমিতি, হেডকোয়ার্টার সিঙ্গাপুরে। ধনঞ্জয় ভূপতি ওটার চেয়ারম্যান ছিল। চেয়ারম্যান সহ বেশিরভাগ সদস্যই মারা গেছে। দ্বিতীয় বোমাটা চিনের উপকূলে ফাটাবার প্ল্যান করেছিল ওরা।'

ক্ষীণ একটু হাসল রানা। 'এখন তা হলে সবাই খুশি?'

'হ্যাঁ, সবাই খুশি, শুধু আমি বাদে। বিশ্বাস করবে, একটানা চারঘণ্টা রেডিওর সামনে থেকে নড়তে পারিনি? ঢাকা থেকে খানিক পর-পর তোমার খবর জানতে চাওয়া হচ্ছে। এই অপারেশনে কার কতটুকু অবদান জানার পর আমার বস্ ললিত মোহন বটব্যাল প্রতিরক্ষা আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করেছেন তোমাকে রাষ্ট্রীয় কোনও সম্মান দেয়া যায় কিনা বিবেচনা করে দেখতে। কী সিদ্ধান্ত হলো জানার জন্যে রেডিও ছেড়ে উঠি কী করে! আমার ধারণা তোমাকে ওঁরা বোধহয় পদ্মশ্রী-ই দেবেন।

'আমি ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাচ্ছি। তুমিও নিশ্চয় লম্বা একটা ছুটি নেবে। কোথায় যাবে, হে? মেয়েটিকে সঙ্গে নেবে নাকি?

'যাই বলো, ভাই, মেডেল পাবার যোগ্যতা মেয়েটিরও আছে। কী সাহস! গাইগার কাউন্টার নিয়ে ধরা পড়ে যায় সে। ভগবানই বলতে পারবে ভূপতি তার ওপর কী অত্যাচার করেছে। তবে মুখ খোলেনি সে–একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

'তারপর সবাই যখন ইয়ট থেকে পানিতে নেমে গেছে, কীভাবে যেন নিজেকে মুক্ত করে কেবিনের পোর্ট হোল দিয়ে ডেকে বেরিয়ে আসে। নিজের অ্যাকুয়ালাঙ আর স্পিয়ার গান ওই কেবিনেই ছিল। পানিতে ডুব দেয় প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। ভূপতিকে খুন করে প্রতিশোধ তো নিয়েছেই, তোমাকেও বাঁচিয়েছে। ভগবানের কিরে, ভাই, জীবনে আর কোন মেয়েকে আমি অবলা বলব না।' হঠাৎ থেমে কান পাতল অনিল। দ্রুত দরজার দিকে এগোল সে। 'সর্বনাশ! ওই জুতোর আওয়াজ আমি চিনি। করিডর ধরে ডাক্তার বরাভয় আসছেন! পরে কথা হবে, রানা।' দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। তারপর করিডরে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল কবাট।

নিস্তেজ গলায়, অসহায়ভাবে, ডাকছে রানা, 'থামো! অনিল! অনিল!' লাভ

হলো না, চলে গেছে সে।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। রাগ হচ্ছে ওর। কেউ ওকে জানাচ্ছে না কেন কেমন আছে মেয়েটি? আর কী হয়েছে না হয়েছে কে তা জানতে চায়? তৃষ্ণা ভাল আছে তো? কোথায় সে?

দরজা খুলে গেল। কোত্থেকে শক্তি পেল কে জানে, ঝট করে বিছানায় উঠে বসল রানা। সাদা কোট পরা মূর্তিটার উদ্দেশে চিৎকার করে বলল। 'মেয়েটি, ডাক্তার। কেমন আছে সে? তাড়াতাড়ি! জানান আমাকে!'

বরাভয় চ্যাটার্জি পোর্ট ব্লেয়ারের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার। এমনিতে তিনি হাসিখুশি মানুষ, তবে এই মুহূর্তে তাঁকে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। দেখাবারই কথা। এই মাত্র ষোলোটা লাশের পোস্টমর্টেম শেষ করতে হয়েছে তাঁকে। তার মধ্যে ছয়টা লাশ ভারতীয় নেভির সদস্যদের। বাকি দশটা ইয়ট জলপরীর আরোহী ছিল।

রানার প্রশ্নের উত্তরে ক্লান্ত সুরে ডাক্তার বরাভয় বললেন, 'মিস তৃষ্ণা কান্তা? ভাল হয়ে যাবেন তিনি। এই মুহূর্তে শক-এ ভুগছেন। তাঁর বিশ্রাম দরকার।'

'আর কি? ঠিক কী হয়েছে তার?'

'অনেক দূর সাঁতরেছেন তিনি। অতটা কায়িক পরিশ্রম করার শক্তি তাঁর ছিল না।'

'কেন?'

দরজার দিকে এগোলেন ডাক্তার। 'এখন বিশ্রাম নেবেন আপনি। আপনার ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ধকল গেছে। ছয় ঘণ্টা পর পর একটা করে ঘুমের ট্যাবলেট খাবেন, মনে আছে তো? আটচল্লিশ ঘণ্টা যেতে দিন, দেখবেন আবার সেই আগের মত সুস্থ লাগছে। তার আগে পর্যন্ত অশান্ত হওয়া চলবে না, মিস্টার রানা।'

অশান্ত হওয়া চলবে না? আশ্চর্য! এরা বোকা নাকি? হঠাৎ রেগে উঠল রানা, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল বেড থেকে। 'ডাক্তার, শুনুন! মেয়েটির কী হয়েছে আমার জানা দরকার। ফর গড'স সেক...'

নরম সুরে ডাক্তার বরাভয় বললেন, 'কেউ একজন তাঁকে নির্যাতন করেছে। পোড়ানো হয়েছে শরীরের অনেক জায়গায়। এখনও খুব ব্যথা পাচ্ছেন তিনি। তবে,' অভয়দানের ভঙ্গিতে একটা হাত ঝাঁকালেন, 'তাঁর ভেতরটা ভাল আছে। পাশের কামরায় আছেন তিনি, চোদ্দো নম্বরে। আপনি তাঁকে দেখতে যেতে পারেন, তবে মাত্র এক মিনিটের জন্যে। তারপর তিনি ঘুমাবেন। ঘুমাবেন আপনিও। ঠিক তো?' দরজাটা খুলে একটু সরে দাঁড়ালেন।

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাক্তার।' এলোমেলো পা ফেলে কামরা থেকে

বেরিয়ে এল রানা। হাঁটু দুটো আবার ভেঙে পড়তে চাইছে। ওকে চোদ্দো নম্বর কামরার দিকে এগোতে দেখছেন ডাক্তার বরাভয়। দরজাটা খুলল রানা। ভিতরে ঢুকে আবার বন্ধ করল সেটা, একজন মাতালের মত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

করিডর ধরে নিজের পথে এগোবার সময় ডাক্তার বরাভয় চ্যাটার্জি ভাবছেন, এতে ভদ্রলোকের কোন ক্ষতি হবে না, আর ভদ্রমহিলার বরং উপকারই হবে। এটাই তাঁর দরকার এখন, প্রিয় পুরুষের একটু আদর।

বন্ধ ঘরের ভিতর। দু'একটা হোঁচট খেয়ে বেডের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। দাঁড়াবার শক্তি ফুরিয়ে আসছে দেখে মেঝেতে হাঁটু গাড়ল। বালিশের উপর মাথাটা ওর দিকে ঘুরে গেল। একটা হাত বেরিয়ে এসে ওর চুল খামচে ধরল, টেনে নিচ্ছে নিজের দিকে। তৃষ্ণার কণ্ঠস্বর খসখসে লাগল ওর কানে। 'তুমি এখানে, আমার কাছে থাকবে। বুঝতে পারছ? তুমি কোথাও যাবে না, ব্যস!'

রানার তরফ থেকে যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না, দুর্বল ভাবে ওর মাথাটা ঝাঁকাল তৃষ্ণা। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, বাবুরাম? নাকি রানা বলে ডাকতে হবে তোমাকে? এই, শুনতে পাচ্ছ কী বলছি?'

তৃষ্ণা অনুভব করল রানার শরীর মেঝেতে ঢলে পড়ছে। চুল ছেড়ে দিতে বেডের পাশে কার্পেটে শুয়ে পড়ল রানা। সাবধানে নিজের পজিশন বদলে ভাল করে ওর দিকে তাকাল তৃষ্ণা। ভাঁজ করা কনুইয়ের উল্টোদিকে মাথা রেখে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে রানা।

গাঢ় রঙের, খানিকটা নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত পর ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, তারপর বালিশটা বেডের কিনারায় সরিয়ে আনল, যাতে সরাসরি রানার উপর থাকে সেটা। বালিশের উপর মাথাটা এমনভাবে রাখল, মন চাইলেই যাতে দেখতে পায় প্রিয় মানুষটিকে। তারপর চোখ বুজল।

***